উপন্যাস

জল-জঙ্গলের কাব্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

এ কী অদ্ভুত হাসি 2
মাধবমাঝির বিবরণ 37
দ্বিতীয় অভিযান 66
সেই মানুষটির উত্তাপ 96
সেয়ানে সেয়ানে 127

এ কী অদ্ভুত হাসি

ব্যাপারটা হল কী, মনোরঞ্জন তার বউয়ের কাছে একটা মিথ্যে কথা বলে ফেলল।

তা পুরুষ মানুষ, বিয়ের পর আট মাস পার হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে বউয়ের কাছে দু-একটা মিথ্যে কথা তো বলবেই। হাটখোলায় কোনও কাজ না থাকলেও সাতজেলিয়া চলে যায়। মোহনবাগানের নামে পাঁচ টাকা বাজি ধরে, বঙ্গেবর্গী পালায় ভাস্কর পণ্ডিত হিসেবে যার খুব নামডাক, সে-রকম মানুষের প্রতি দিন অন্তত গোটা তিনেক মিথ্যে কথা না বললে চলবে কেন? তবে এই বিশেষ মিথ্যেটি বলার সময় তারও বুক কেঁপেছিল।

নদীর ধারে একলা মনোরঞ্জন দাঁড়িয়ে ছিল বিকেলবেলা। এই সেই বিশেষ ধরনের বিকেল, যে বিকেলে পৃথিবী প্রত্যেক দিনের মতো আটপৌরে নয়। পৃথিবীরানি যেন আজ বেনারসি শাড়ি পরে, যত্ন করে সেজেগুঁজে আজ কোথাও বেড়াতে যাবেন। নদীর ওপরের আকাশ খুনখারাবি লাল। নদীর জলে লম্বা লম্বা লকলকে লাল শিখা, কিছু দূরের একটি পালতোলা নৌকো এখন ক্যালেন্ডারের ছবি হয়ে গেছে, লালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আকাশের বাকি অংশ প্রগাঢ় নীল, এক ঝাঁক বেলেহাঁস চন্দ্রহার হয়ে উড়ে আসে লাল থেকে নীলের দিকে।

মনোরঞ্জন পরে আছে সাদা থানের লুঙ্গি, খালি গা, ডান বাহুতে কালো কার দিয়ে বাঁধা একটা তামার কবচ, তার সরু কোমর থেকে ত্রিভুজ হয়ে উঠেছে বুক, লোহার মতো গায়ের রঙ, সরু চিবুক, ধারালো নাক, চোখ দুটি মুখের তুলনায় ছোট, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। মনোরঞ্জন আকাশে সূর্য-বিদায়ের দৃশ্য দেখছে না, সে চেয়ে আছে পালতোলা নৌকোটির দিকে। শীত সদ্য শেষ হয়েছে, বাতাস এখনও মন্থর, বঙ্গোপসাগরের অনেক দূরে মেঘ, এদিকে আসতে দেরি আছে।

এই যে মনোরঞ্জন, এমন সুঠাম চেহারার যুবা, আজ বিকেলে তার মন ভাল নেই।

দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করতে করতেই যেন মনোরঞ্জন নৌকাটিকে টেনে আনল নিজের কাছে। নৌকোটি জেটি ঘাটের পাশে এসে ভিড়ল। এক জন মাঝি ছাড়া নৌকোর আর কোনও যাত্রী নেই।

বাঁধের ওপর থেকে নেমে গিয়ে নৌকোটির কাছে এসে মনোরঞ্জন জিজ্ঞেস করল, কী মাধবদা, কেমন উঠল আজ?

মাধব মাঝি জেটির থামের সঙ্গে দড়ি বাঁধতে বাঁধতে সংক্ষেপে উত্তর দিল, কিছু না।

মনোরঞ্জন নৌকার ওপর নেমে গিয়ে মাধব মাঝিকে পাল গুটোতে সাহায্য করতে লাগল। সেকাজ সমাপ্ত হলে সে তার লুঙ্গির ট্যাঁক থেকে বার করল একটি ছোট জার্মান সিলভারের কৌটো। তার থেকে আবার বিড়ি এবং কেরোসিন লাইটার বার করে বলল, নাও মাধবদা, বিড়ি খাও।

দু’জনে দু’টি বিড়ি ধরাল।

নৌকার খোলে অনেকখানি জল উঠেছে। সেঁচে ফেলা দরকার। মনোরঞ্জন জিজ্ঞেস করল, জল ছেঁচে দেব নাকি?

এবারও মাধব সংক্ষিপ্ত ভাবে বলল, ছাঁচ!

মনোরঞ্জন নারকোল মালা নিয়ে জল সেঁচতে লাগল আর মাধব বিড়ি টানতে টানতে সরু চোখে চেয়ে রইল সে-দিকে। মাধবের জলে ভেজা, রোদে পোড়া শরীরটা দেখলে বয়েস বোঝা যায় না। তার মেদহীন শরীরটা এমনইটনকে যে মনে হয় তার চাতালো বুকটায় টোকা মারলে টংটং শব্দ হবে। তার মুখে তিন-চার দিনের রুখু দাড়ি, মাথায় একটা গামছা জড়ানো। মাধবের চোখ দুটি এমনই। উজ্জ্বল যে একনজর দেখলেই বোঝা যায়, সে সাধারণ পাঁচ-পেঁচি ধরনের মানুষ নয়।

মনোরঞ্জনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মাধব জিজ্ঞেস করল, এত খাতির কীসের জন্য রে? সাধুদা তোমাকে একবার ডেকেছে।

মাধব চিক করে জলে থুতু ফেলে বলল, যা যা, এখন ভাগ তো, তোগো ওই সব মতলোবের মধ্যে আমি নাই।

মনোরঞ্জন পাটাতনের ওপরে বসে বলল, এক কাপ চা তো খাবে, সারা দিন খেটে খুটে এলে?

আমার অত চায়ের শখ নাই।

অত রাগ করছ কেন? এখন তোমার কী কাজ আছে আর? একটু না হয় বসলেই আমাদের সঙ্গে। তাস খেলবে না?

না।

পাটাতনের নিচে হাত ঢুকিয়ে মাধব একটা খালুই টেনে বার করল। তাতে রয়েছে সাড়ে তিনশো চারশো ওজনের একটা ভাঙর, আর দুতিন মুঠো মৌরলা মাছ। বেচলে বড় জোর পাঁচ-ছ'টাকা পাওয়া যাবে, তার মধ্যে দু'টাকা দিতে হবে মহাদেব মিস্তিরিকে নৌকো ভাড়া হিসেবে, বাকিটা মাধবের আজ সারা দিনের উপার্জন। শীতের শেষের নদীতে মাছ পাওয়াই দুষ্কর।

খালুইটা হাতে নিয়ে মাধব জেটিতে উঠে গেল। মনোরঞ্জন বুঝল, মাধবের মেজাজ এখন নরম করা যাবেনা।

সপ্তাহে এক দিন হাট, তবে বিষ্টুর চায়ের দোকান রোজই ভোলা থাকে। একটা বার্লির কৌটোর তলা কেটে, তারের হাতল লাগানোতার চায়ের ছাঁকনি। কেটলিতে গুঁড়ো চা

সবসময় ফুটছে। উনুনে কাঠের আগুনের আঁচ। একটা আস্ত বানীগাছের গুঁড়ির দু'পাশে দু'টি খুঁটি লাগিয়ে দোকানের সামনে বসান। সেটাই খদ্দেরদের বেঞ্চি।

বিষ্টুর গোঁফ খুব বিখ্যাত, শিয়ালের ল্যাজের মতো পুরুষ্ট, সেই জন্যই হাটুরে লোকেরা তার নাম দিয়েছে মোচা বিষ্টু। তার দোকানের চায়ের ডাকনাম, মোচা বিষ্টুর পেচ্ছাপ। তবু হাটবারে কিংবা বিকেল চারটের লঞ্চ এসে যখন ভেড়ে, তখন অনেকেই সেই চা খেতে আসে।

বানীকাঠের গুঁড়ির বেঞ্চিতে বিষ্টুর দোকানের দিকে পিছন ফিরে বসে বিকেলের দিকে মনোরঞ্জনদের আড্ডা বসে। সে ছাড়া আর সুভাষ, বিদ্যুৎ, নিরাপদ আর সুশীল। আর সাধুচরণ, সে আগে আসে হঠাৎ হঠাৎ। যতক্ষণ না সন্ধে হয়। ঠিক সন্ধের সময় কোথা থেকে এক ঝাঁক পোকা উড়ে আসে, কান নাকের ফুটোর, আর কথা বললেই মুখের মধ্যে ঢুকে যায়। তখন আর এক জায়গায় বসে থাকা যায় না।

এই কয়েক জনের মধ্যে বিদ্যুৎ বরাবরই রোগা প্যাংলা, সুভাষ একটু মোটা ধাঁচের, বাকি তিন জনের গড়াপেটা চেহারা, অবশ্য মনোরঞ্জনের মতো কেউ না। এবার ওদের চেহারা ক্ষয় হতে শুরু করবে। এখন তো ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি, বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে কেউ এসে মনোরঞ্জনকে দেখুক তখন তার কণ্ঠার হাড় জেগে যাবে, গোনা যাবে বুকের পাঁজরা ক'খানা, চক্ষু ঢুকে যাবে কোটরে, শরীরটাকে মনে হবে খাঁচা।

সেই অঘ্রাণের শেষ থেকেই ওদের হাতে কোনও কাজ নেই। কাজ না থাকলে আলস্যে ওদের শরীর ভাঙে। ওদের জন্য আবার কাজ আসবে, আকাশ থেকে, যদি বৈশাখে ঠিকঠাক সময়ে বৃষ্টি নামে। ভূমির মতোই, এই সব ভূমিজ মানুষেরও শরীর পুষ্ট হয় বৃষ্টির জলে।

কথাটা প্রথম তুলেছিল নিরাপদ। একবার জঙ্গলে গেলে হয় না?

অন্যরা প্রথমে উড়িয়ে দিযেছিল কথাটা। দিনকাল পালটে গেছে। বাপ-ঠাকুদারমুখে যেসব গল্প শুনেছে, তা আর আজকাল চলে না। এখন আইন-কানুনের হাত অনেক লম্বা হয়েছে। যখন তখন খপ খপ করে ধরে।

তবু ঘুষঘুষে জ্বরের মতো, খিদের মতে, রাতচরা পাখির ডাকের মতো কথাটা ফিরে ফিরে আসে। মনে মনে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে। অঘ্রাণ থেকে বৈশাখ, কিছু করার নেই, শুধু তাস পাশা খেলা আর বিড়ি টানা। যদিবা দু'এক দিনের ফুরনের কাজ জোটে, কিন্তু এই সময়টা তাল বুঝে কেউ পুরো মজুরি দিতে চায় না। পরিমল মাস্টারের পরামর্শে দুটো শীতে মনোরঞ্জন রাশিয়ান বীটের চাষ দিয়েছিল, শালগমের মতো রাশিয়ান বীটের চারাগুলো তরতরিয়ে বাড়ে, দামও মন্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু গত বছর অসময়ের ঝড়-বৃষ্টিতে সবনষ্ট হয়ে গেছে। মূলধন পর্যন্ত বরবাদ। তাই এ বছর কেউ ওই চাষে যায়নি।

হাটখোলার একটি খালি আটচালায় ওদের যাত্রার রিহার্সাল হয়, কিন্তু এ বছর কারুরই যেন রিহার্সালে মন নেই। গত মাসে কলকাতার এক পার্টি এসে জয়মণিপুরে তিন দিন তিনটে পালা করে গেল চুটিয়ে, আশপাশের দশখানা গাঁ থেকে লোক গিয়েছিল ঝেটিয়ে। এরপর আর নাজনেখালির জয়হিন্দক্লাবের যাত্রা কে দেখবে? গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। তাছাড়া অশ্বিনীকে সাপে কাটবার পর থেকেই জয়হিন্দ ক্লাবটা একেবারে ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেছে। অশ্বিনীই ছিল এই ক্লাবের প্রাণ, প্রমটার, ড্রেসার থেকে পরিচালক পর্যন্ত।

যদি অশ্বিনী ফিরে আসে। অশ্বিনী মারা গেছে, তবু অশ্বিনী ফিরে আসতে পারে। মনোরঞ্জন বিশ্বাস করে না, সুভাষ, বিদ্যুৎরা কেউ-ই বিশ্বাস করে না, তবু অশ্বিনীর দাদা হরিপদ যখন বলে যে লখিন্দর ফিরেছিল, অশ্বিনী কেন ফিরতে পারবে না তখন প্রতিবাদ করে না ওরা। কলার ভেলায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে অশ্বিনীকে, সঙ্গে নাম-ঠিকানা লেখা কাগজ। এমন কাজের মানুষ ছিল অশ্বিনী, তাকে ফিরিয়ে দিলে ভগবানের সুনাম হত।

নিরাপদর কথাটা উস্কে দেয় সাধুচরণ। যদি বাপের ব্যাটা হোস, যদি হিম্মত থাকে, তবে চল জঙ্গলে যাই।

জেল থেকে ফিরে এসে সাধুচরণ খুব দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। চুরি-ডাকাতি নয়, জয়মণিপুরে জমি দখলের দাঙ্গায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল সাধুচরণ, দেড়টি বছর ঘানি ঘুরিয়ে গ্রামে ফিরেছে। এ গ্রামে সেই একমাত্র জেল-ফেরত মানুষ। জেল-ফেরত তো নয়, যেন বিলেত-ফেরত। জেলে থাকলে স্বাস্থ্য ভাল হয়, আগে ছিল দোহারা গড়ন, এখন চেহারায় কী চেকনাই!

পরিমল মাস্টার সাধুচরণকে একটা কাজ দেবেন বলেছেন। তা-ও বৈশাখ মাসে। এমন নিশ্চিন্ত আশ্বাস পেয়েও সাধুচরণ জঙ্গলে যেতে চায় শুনে অন্যরা লজ্জা পায়।

হাটখোলার আটচালায় হোগলা পেতে শুয়ে, বসে আছে ওরা রিহার্সাল বন্ধ বলে হ্যাজাক জ্বালানো হয়নি, অবশ্য আজ বেশ চাঁদের আলোর ফিনকি দিয়েছে। বিষ্টুর দোকানও বন্ধ হয়ে গেছে, চারদিক নিস্তব্ধ। একসময় নদীর বুকে ঘ্যাসঘেসে আওয়াজ আর ভ্যাঁ ভ্যাঁ হর্নের শব্দ শুনে ওরা বুঝতে পারে পুলিশের লঞ্চ যাচ্ছে। প্যাসেঞ্জার লঞ্চ তো দিনে মাত্র সেই একবার।

বিদ্যুৎ মাটি থাবড়ে বলল, আমি রাজি।

সাধুচরণ খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসেবিড়ি টানছিল, সে বলল, অন্তত ছ’জন তো লাগবেই।

মনোরঞ্জন বলল, আমি রাজি।

বিদ্যুৎ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, আরে দুর দুর তুই রাজি হলেই বা তোকে নেবে কে? তুই বাদ।

সাধুচরণ বলল, মনোরঞ্জনকে বাদ দিয়ে এই আমরা পাঁচ জন। আর যদি মাধবদা যায়- ।

বিদ্যুৎ বলল, মাধবদাই তো আসল লোক।

মনোরঞ্জন দুর্বল ভাবে বলল, কেন, আমি বাদ কেন?

কারণটা তো মনোরঞ্জন নিজেই জানে, তাই তার গলার আওয়াজে জোর নেই। তার বিয়ের এখনও বছর পেরোয়নি, তার এখন জঙ্গলে যাওয়ার তো কোনও প্রশ্নই ওঠেনা।

সাধুচরণ বলল, তুই যা তো মনা, তুই এখন বাড়ি যা। আমাদের এখন অনেক কথা রইয়েছে।

সুভাষ উদারতা দেখিয়ে বলল, আমার টর্চলাইটটা নিয়ে যা।

কিন্তু মনোরঞ্জন তক্ষুনি বাড়ি যায় না, আরও কিছুক্ষণ বসে থাকে। গুম হয়ে বসে থেকে ওদের আলোচনা শোনে আর উদাসীন ভাবে বিড়ি টানে।

ওরা আলোচনাই চালিয়ে যায় শুধু, শেষ পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। জঙ্গলে যাওয়ার অনেক হ্যাপা। এ তো আর বেড়াতে যাওয়া নয়। সব বন্দোবস্ত করতে গেলে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হবে। কোনও আড়তদারের কাছ থেকে দাদন নিয়ে যাওয়া যেতে পারে বটে, কিন্তু ওরা তা চায় না। ওরা চায় স্বাধীন ভাবে যেতে।

বাড়ি ফিরে মনোরঞ্জন প্রথমেই উঠোনে গোলার গায়ে হাত বুলোয়। ইঁদূরে গর্ত করেছে কি না দেখে নেয়। এঁটেল মাটিতে গোবর মিশিয়ে এমন ভাবে লেপে দেওয়া আছে, যেন সিমেন্ট করা। গোলার গায়ে দু'বার থাবড়া মারে মনোরঞ্জন। কত আর হবে, বড় জোর দু'বস্তা ধান। বাড়িতে পাঁচটি প্রাণী দু'বেলা খাবারের জন্য হাঁ করে আছে, এতে কটা দিন চলবে?

মনোরঞ্জনের বাপ-মা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। কেরোসিনের খরচা বাঁচাবার জন্য ওরা সন্ধে সন্ধেতেই ভাত খেয়ে নেয়। মনোরঞ্জনের বাপের নাম বিপদ, মায়ের নাম ডলি। চাষির বাড়ির বউয়ের নাম ডলি? এতে অবিশ্বাসের কী আছে, এ-দিকে হ্যামিল্টন সাহেবের জমিদারি ছিল না? যখন আচ্ছা আচ্ছা গ্রামে ইস্কুল বসেনি, তখন থেকেই

পাকাবাড়ির ইস্কুল আছে জয়মণিপুরে। দেখবার মতো ইস্কুল! বিষ্টুপদ এবং মনোরঞ্জন দু'জনেই মাঠে হাল ধরে বটে, দু'জনেই কিন্তু ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়েছে। মনোরঞ্জনের ছোট ঠাকুদ্দা, অর্থাৎ ঠাকুর্দার ছোট ভাইয়ের নাম জেমস সন্তোষ খাঁড়া, তিনি অবশ্য খ্রিস্টানই হয়েছিলেন।

সরু লাল-পেড়ে শাড়ি পরা মাঝবয়সি মনোরঞ্জনের মা যখন পাছ-পুকুরে বাস মাজতে যায়, তখন তাকে কেউ ডলি বলে ডাকলে তা শুনে নতুন কোনও লোক চমকে উঠতে পারে, কিন্তু এখানকার কেউ চমকাবেনা। হ্যামিল্টন সাহেবনরেনের পিসিমাকে আদর করে ডাকতেন বেবি। বুড়ি বয়েস পর্যন্ত তাঁর সেই বেবি নামই থেকে গিয়েছিল।

মনোরঞ্জনের দুই দাদা বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। বড়দা নিজের শ্বশুরবাড়ির গ্রামে জমি পেয়ে সেখানেই বসতি নিয়েছে, মেজদা গোসাবায় ডাবের ব্যবসা করে। ছ'ভাই-বোনের মধ্যে দুটি টুপটাপ মারা গেছে অকালে, ছোট বোনটি ক্লাস নাইনে দু'বার ফেল করে বিয়ের দিন গুনছে মনে মনে।

মনোরঞ্জন বাড়িতে না ফেরা পর্যন্ত তার ছোট বোন কবিতা তার বউ বাসনার সঙ্গে গল্প করে। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক কাহিনির বদলে যাত্রায় আজকাল সামাজিক বিষয়বস্তু থাকে বলে গ্রামের ছেলে-মেয়েদের নামও পাল্টে যাচ্ছে। তাছাড়া সিনেমার নায়ক-নায়িকার নাম ইলেকট্রিসিটি নেই, তবু এই গ্রামেও মাসে একবার সিনেমা আসে।

কবিতার ডাকনাম কুঁচি। গায়ের রঙ একটু ফর্সা-ফর্সা, মুখটা একেবারে লেপাপোঁছা।

ঘরে জ্বলছে হ্যারিকেন আর বাজছে রেডিয়ো। রেডিয়োতে এ-রকম একটা গান শোনা যাচ্ছে; অশ্রুনদীর...ঘ্যাটো ঘ্যাটো ঘ্যাটো ঘ্যাটো...সুদূর..ঘ্যাটো ঘ্যাটো...ঘাট দেখা যায়...ঘ্যাট ঘ্যাটো ঘ্যাটো। খুবই দুর্বল হয়ে গেছে ব্যাটারিগুলো, না পালটালে আর চলে না। রেডিয়োটা বিয়ের সময় পাওয়া, মাঝখানে দু'বার মাত্র চারখানা করে ব্যাটারি কিনেছে মনোরঞ্জন।

গানটা শুনেই মনোরঞ্জন বুঝতে পারে এখন পৌনে দশটা বাজে। এমন কিছু রাত নয়। তাস খেলা জমলে এক-এক দিন বারোটা-একটা বেজে যায়।

বারান্দায় বালতিতে জল রাখা আছে, মনোরঞ্জন হাত-পা ধুয়ে ঘরে এসে বোনকে বলল, আমার ভাত বেড়ে দে বুঁচি। তোরা খেয়েছিস?

কবিতা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই মনোরঞ্জন তার বউয়ের থুতনি ধরে বলল, বাসনা আমার বাসনা, একবারটি হাসো না!

বাসনা ফোঁস করে উঠল, এই কী হচ্ছে!

মনোরঞ্জন তবু বাসনার ডান গাল টিপে ধরে বলল, পুটু পুটু পুটু পুটু পুটু।

বাসনা ক্রুদ্ধ বিড়ালির মতো ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে, মনোরঞ্জন ততই খুনসুটি করতে থাকে। তারপর বুঁচি এসে ঘরে ঢুকতেই সে চট করে হাতটা সরিয়ে নেয়। এক দিন সে বাসনাকে চুমো খেতে গিয়ে বোনের সামনে ধরা পড়ে গিয়েছিল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে দিনের শেষ বিড়িটি ধরিয়ে মনোরঞ্জন একটু বারান্দায় বসে। উঠোনের মাঝখানে তুলসী মঞ্চ, বাঁ-পাশে গোয়াল ঘর, ডান পাশে রান্নাঘর, তার পাশে মাচা বাঁধা, সেখানে উচ্ছে গাছ দুলছে। বাড়িটি বেশ ঝকঝকে তকতকে, চালে নতুন খড় ছাওয়া হয়েছে এ বছরই। গোয়ালঘরটি অবশ্য এখন ফাঁকা, গত গ্রীষ্মে গো-মড়কে একটি হেলে বলদ মারা যাওয়ায় ঝটিতি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল অন্যটাকে।

শয়নঘর দু'টি, কবিতা বাপ-মায়ের ঘরেই মেঝেতে শোয়। ওর ভয়ের অসুখ আছে, মাঝে মাঝে ওকে ওলায় ধরে, ঘুমের ঘোরে গোঁ গোঁ করে চেঁচিয়ে ওঠে হঠাৎ। কটরাখালির সাধুবাবার কাছে ওকে নিয়ে যাব যাব করেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না। তিনি এইসব রোগের একেবারে ধন্বন্তরি। বিয়ের আগে কবিতার এই অসুখ তো সারিয়ে ফেলতেই হবে।

সুখটান দেবার পর বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘরে চলে আসে মনোরঞ্জন। তক্তপোশের ওপর উঠে বসে বলল, ওঃ হো, তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলেই গেছি। তোমার বাপের বাড়িতে তো কাল ডাকাত পড়েছিল।

বাসনা ভেতরের জামা খুলছিল পেছন ফিরে, চমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, অ্যাঁ?

মনোরঞ্জন বলল, চারটের লঞ্চে লারানদা এল, তার মুখেই শুনলাম মামুদপুরে কাল বড় ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কার বাড়ি? কার বাড়ি? লারানদা বললে, যে নিতাইচাঁদ হরিণের মাংস বেচতে গিয়ে ধরা পইড়েছিল বসিরহাটে, সেই নিতাইচাঁদের বাড়ি। নিতাইচাঁদ তোমার কাকার নাম না?

বাসনার ছেলেমানুষি মুখখানি আতঙ্কে কালো হয়ে যায়। সে চোখ কপালে তুলে বলল, এ খবর শুনেও তুমি চুপ করে বসে রইলে?

তা কী করব, ল্যাজ তুলে দৌড়োব? লারানদা যখন কথাটা বললে, ততক্ষণে লঞ্চ ছেড়ে গিয়েছে। তা ডাকাতি যখন হইয়েই গিয়েছে, এখন আমার যাওয়া না-যাওয়া সমান।

ডাকাতরা আমাদের বাড়ি থেকে কী নেবে?

তোমার কাকাটা তো একনম্বরের চোর। চোরাই মাল কত লুকিয়ে রেখেছিল কে জানে।

মানুষ মেরেছে?

দু'জনের তো মাথা ফেটেছে শুনলাম।

অ্যাঁ? কার? কার মাথাটা ফেটেছে?

তা আমি কী করে জানব। লারানা তো আর নিজের চক্ষে দেখেনি।

এসব ইয়াকির কথা। প্রতি রাত্রেই মনোরঞ্জন এই ধরনের উদ্ভট কোনও গল্প বানিয়ে চমকে দেয় বউকে। বাসনার চোখে জল এসে গেলে সে হো-হো করে হেসে ওঠে। তখন বাসনা এসে তার বুকে গুম গুম করে কিল মারতে থাকে আর বলে, আমার কাকা মোটেই চোর নয়।

তখনও মনোরঞ্জন তার বউকে জড়িয়ে ধরে খুব আদর করে আর খেপায়, চোরই তো, নিশ্চয়ই চোর। তোমরা একেবারে চোরের বংশ, তুমি নিজেও তো একটু চুর্নী।

পাশের ঘর থেকে কবিতা এসবকিছুই শুনতে পায়। এমনকী নিয়মিত ছন্দে এ ঘরের তক্তপোষের মচমচানির শব্দ পর্যন্ত।

তবে এই আসল মিথ্যে কথাটা অবশ্য মনোরঞ্জন সেই রাত্রে বাসনাকে বলেনি। সেটা অন্য রাতের কথা।

সারা দিন মনোরঞ্জন তক্কে থাকে মাধবকে ধরার জন্য। তার নিজের কোনও স্বার্থ নেই, তবু বন্ধুদের রোমাঞ্চকর অভিযানটা যাতে পণ্ড না হয়ে যায়, সেই জন্য সে মাধবকে ভোলাবার চেষ্টা করে। মাধবকে আগ বাড়িয়ে বিড়ি দেয়, মাধবের বাড়ির উঠোনের আগাছা সাফ করে দিয়ে আসে, মাধবের ছোট ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে লোপালুপি খেলে। তবু মাধব তাকে পাত্তাই দেয় না।

দিন তিনেক এড়িয়ে এড়িয়ে থাকার পর মাধব শেষ পর্যন্ত নিজে থেকেই ধরা দেয়।

দুপুরবেলা আটচালায় তাস খেলা জমে উঠছে, কখন যে মাধব পেছনে এসে বসেছে ওরা টেরও পায়নি। মাধব তাসের পোকা। হঠাৎ মাধব এক সময় বলে উঠল, আরে ও মনা, কী কল্লি! আরে এডা দেখি একটা রামছাগল। হাতে রঙ রইছে, তুরুপ মারতে পাল্লি না।

মনোরঞ্জন ফিরে তাকাতেই মাধবতার অত্যুজ্জ্বল চোখদুটি ঝকমকিয়ে বলল, তোরা দাইরাবান্দা খ্যাল, তাস খেলা তোগো মগজে কুলাবেনা।

চার খেলুড়িই ফেলে দিল হাতের তাস। সাধুচরণ বলল, মাধবদা, তোমার সঙ্গে একটা প্রাইভেট কথা আছে।

মাধব বলল, জানি, জানি, তোমাগো কী কথা। ওসব আমার দ্বারা হবে না। আমার পিঠে এখনও দাগ রইছে।

দুজনই একসঙ্গে বিড়ি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নাও মাধবদা, খাও।

দুজনের থেকেই বিড়ি নিয়ে একটা ট্যাঁকে গুঁজে আর একটির পেছনে ফুঁ দিতে দিতে মাধব বলল, যতই খাতির করো, ও লাইনে আমি আর যেতে পারব না। আজকাল ও লাইন খারাপ হয়ে গিয়েছে।

মাধবের মতো কর্মিষ্ঠ-পুরুষ সচরাচর দেখা যায় না। তাকে মাঝি বলা যায়, জেলে বা যায়, চাষি বা কাঠুরে বা ঘরামিও বলা যায়, সবকাজে সে সেরা। তার কাজের ক্ষমতা এবং বুদ্ধি দুটোই আছে, সেই জন্য অনেকে তাকে সমীহ করে। যারা হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় পতাকা ওড়ায়, যারা অকুল সমুদ্রে নতুন দেশ আবিষ্কারের জন্য বেরিয়েছে এককালে, যারা যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে শত্রুর দেশে দাঁড়িয়ে চওড়া কাঁধ আরও চওড়া করে গর্বের হাসি দেয়, তাদের মুখের সঙ্গে মিল আছে মাধবের।

তবু মাধব সংসারের ব্যাপারে বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। একটা ছোট চৌহদ্দির বাইরে সে কোথাও যায়নি কখনও। বেঁচে থাকাটাই তার একমাত্র অভিযান। তার জমিও নেই, মূলধনও নেই। শুধু গায়ে খেটে আর কতখানি সমৃদ্ধি হবে। বাড়িতে তার সাতটা পেট। তার নিজের নৌকোটি চলে যাওয়ায় সে আরও বিপাকে পড়েছে।

সাধুচরণ বলল, যদি পারমিট জোগাড় কবি মাধবদা?

মাধব সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলল, পারমিট জোগাড় করবি, তুই? হেঃ! তোকে পারমিট দেবে? হেঃ!

ধরো না, যদি জোগাড় করিই?

ধর না, আমি লাটের ব্যাটা বড়লাট আর আমার মেয়ে ইন্দিরে গান্ধী! ধরতে আর ঠ্যাকাটা কী, তাতে তো পয়সা লাগে না!

তুমি বিশ্বাস পাচ্ছ না, মাধবদা, পারমিটের ব্যবস্থা আমি সত্যিই করতে পারি। এখন তুমি রাজি হলেই হয়।

দেখ সাধু। আমার সঙ্গে ফোর টুইন্টি করিসনি! আমি তিন-তিনবার ধরা পড়িছি, মেরে আমার তক্তা খিচে দিয়েছে, আমার লৌকোটা পর্যন্ত সুমুদ্ধির পুতরা বাজেয়াপ্ত কইরা নিছে। আবার আমি তোগো কথায় নাইচ্যা আবার ও লাইনে যামু?

মাধবদা, সবাই বলে তোমার ভয়-ডর কিছু নেই, এখন দেখছি তুমিই ভয় পাচ্ছ।

ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি, ভয় পাব না? আমি মলে তুই আমার বউরে বিয়া করবি? আমার পোলাপানগো খাওয়াবি? যমরে ভয় করি না, কিন্তু পুলিশ আর ফরেস্টের লোক আমারে ছিবড়া কইরা দিছে।

সবাই বুঝতে পারে যে মাধব গরম হয়ে এসেছে। মাধব দুঃসাহসী। শুধু দৈহিক পরিশ্রম করে কোনওক্রমে টেনেটুনে সংসার চালানোয় সে বিশ্বাসী নয়। হঠাৎ কোনও ঝুঁকি নিয়ে ভাগ্য ফেরাতে চায়। ভাগ্য ফেরেনি বটে, তবে এ-রকম ঝুঁকি সে বার বার নিয়েছে। অন্তত তিনবার সে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে। একবার ডাকাতরা তার নৌকো থেকে সব কিছু কেড়েকুড়ে তার পরনের কাপড়ও খুলে নিয়ে ন্যাংটো করে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল চামটা ব্লকে। সেখান থেকেও প্রাণে বেঁচে সে ফিরতে পেরেছে।

এ-রকম ঝুঁকি যারা নেয়, তাদের স্বভাব সারা জীবনে বদলায় না।

সাধুচরণ সত্যিই অনেকটা এগিয়ে এনেছে কাজ। জয়মণিপুরের আকবর মণ্ডলের পারমিট আছে, এক ভাগ বখরা দিলেই সে পারমিট ব্যবহার করতে দিতে রাজি আছে। এর মধ্যে বে-আইনি কিছু নেই।

সকলের দিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকিয়ে মাধব বলল, সঙ্গে আর কে যাবে, এই সব চ্যাংড়ারা? এরা তো একটা হাঁক শোনলেই পাছার কাপড় নষ্ট কইরা ফ্যালাবে।

মূল প্রস্তাবকারী নিরাপদ এবার বলল, ও-কথা বোলো না মাধবদা! জঙ্গলে তুমি একাই যাওনি, আমরাও গেছি। আমি তো তিনবার গেছি।

মাধব বলল, হ্যাঁ, গেছিলি। গত সালে ফুলমালা লঞ্চে টুরিস্টবাবুদের রান্নার জোগাড়ে হয়ে গেছিলি না?

মাধবের গলার আওয়াজে রাজ্যের অবজ্ঞা ঝরে পড়ে।

সাধুচরণ বলল, শোনো আমরা কে কে যাব। তুমি, আমি, নিরা–।

মাঝখানে বাধা দিয়ে সুশীল বলে ওঠে, আমি কিন্তু যেতে পারব না। জয়নগরে আমার মামার মেয়ের বিয়ে আছে–।

মাধবআর সাধুচরণদু'জনেই জ্বলন্ত চোখে তাকাল সুশীলের দিকে। মাধব পিচ করে থুতু ফেলল পাশে।

সাধুচরণ বলল, তোকে নিতামও না আমরা।

মাধব শুধু বলল, হেঃ।

সাধুচরণ আবার বলল, সুভাষ, বিদ্যুৎ, নিরাপদ, তুমি আর আমি।

মনোরঞ্জন বাদ। যদিও সে সামনে ঠায় বসা। সবার চেয়ে বলশালী চেহারা তার, এবং সে ভিতু এমন অপবাদ ঘোর নিন্দুকেও দিতে পারবে না।

সাধুচরণ বলল, আকবর মণ্ডলের পারমিট, তাকে নিয়ে মোট ছয় ভাগ।

মাধব বলল, নৌকোর এক ভাগ লাগবে না? নৌকো তোরে মাগনায় কে দেবে?

নিরাপদ বলল, ঠিক, নৌকোর ভাগ ধরা হয়নি। তা হলে সাত ভাগ। মহাদেবদার নৌকো।

মাধব বলল, আট ভাগ হবে, আমার দুই ভাগ। গুণিনের ভাগ নাই?

সাধুচরণ অন্যদের মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, রাজি।

এবার জোগাড়যন্তরের পালা। শুধু পারমিটের দোহাই দিলেই তো হবে না। খোরাকি জোগাড় করতে হবে, যাওয়া-আসা অন্তত এক মাসের ধাক্কা। এই এক মাস বাড়ির লোকজন কী খেয়ে থাকবে তা ভাবতে হবে, নিজেদেরও রান্না করে খেতে হবে। আর আছে বনবিবির পুজো।

আগে যারা ধার-দেনা করে জঙ্গলে যেত, ফিরে এসে দেখত লাভের ধন সব পিঁপড়েয় খেয়ে গেছে। এখন আর মহাজনদের অতটা সুদিন নেই, অন্তত এ-দিককার পিঠোপিঠি কয়েকটা গ্রামে।

মনোরঞ্জন দল-ছাড়া হয়ে গেছে, তবু সে-ই আগ বাড়িয়ে বলল, পারমিট যখন আছে, তখন পরিমল মাস্টারের কাছে চলো না!

পরিমল মাস্টারের নামে সাধুচরণ একটা গা মোচড়া-মুচড়ি করে। কথাটা ঘোরাবার জন্য সে বলল, ক'বস্তা ধান লাগবে আগে হিসেব করো না।

মাধব এসবকথার মধ্যে থাকতে চায় না। ভাড়াটে সৈন্যের মতো সে শুধু নিজেরটা বোঝে। উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, আমার বাড়ির জন্য দু'বস্তা ধান আর অন্তত নগদা একশোটি টাকা রাইখ্যা যাইতে হবে। সে-ব্যবস্থা তোমরা করো।

ঘুরেফিরে আবার পরিমল মাস্টারের নাম আসে। সাধুচরণ বলল, মহাদেবদা যদি তিনশোমণি নৌকোটা দেয়, আর বিনা সুদে কিছু টাকা-।

মহাদেব মিস্তিরি সম্পর্কে কাকা হয় বিদ্যুতের। সেই বিদ্যুৎই বলল, ও দেবে বিনা সুদে টাকা? তুমি পেঁপেগাছে কাঁঠাল ফলতে দেখেছ বুঝি?

সাধুচরণ পরিমল মাস্টারের প্রিয়পাত্র, তবু সে কেন ওঁকে এড়িয়ে যেতে চাইছে, তা অন্যরা বুঝতে পারে না।

সাধুচরণ আবার ওদের প্রস্তাবে বাধা দেবার জন্য বলল, মাস্টারমশাই কলকাতায় গেছেন, কবে ফিরবেন, তার ঠিক নেই।

মনোরঞ্জন টপ করে জানিয়ে দিল, না না, মাস্টারমশাই কালই ফিরেছেন আমি দেখেছি। জলপরি লঞ্চে এলেন।

দুদিন পরে খুব ভাল খবর পাওয়া যায়।

নিরাপদ আর বিদ্যুৎ দেখা করেছিল পরিমল মাস্টারের সঙ্গে। নিজের কোনও স্বার্থনা থাকলেও মনোরঞ্জনও গিয়েছিল বন্ধুদের সঙ্গে। পরিমল মাস্টার দারুণ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। টাকা-পয়সার আর কোনও প্রশ্নই নেই। চাল-ডাল-তেল-নুন যখন যা লাগবে, ওদের পরিবারের লোকেরা তা সময় মতো নিয়ে আসতে পারবে জয়মণিপুরের কো-অপারেটিভের দোকান থেকে। ওরা নিজেরাও প্রয়োজন মতো সেই সব জিনিস নিয়ে যেতে পারবে নৌকোয়। শর্ত হল, ফিরে এসে মাল বেচে আগে শোধ করে দিতে হবে ওই সব জিনিসের দাম। সুদ লাগবে না এক পয়সাও।

এরপর সাজ সাজ রব পড়ে যায়। আর কোনও বাধাই রইল না। সামনের বানেই যাত্রা শুরু।

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে উঠে মনোরঞ্জন চেঁচিয়ে উঠল, ওঃ মা, মা, মা মা!

ভয় পেয়ে কী হল, কী হল, বলে চেঁচিয়ে উঠল বাসনা। স্বামীকে জড়িয়ে ধরল।

মনোরঞ্জন হাত জোড় করে শিবনেত্র হয়ে বলতে লাগল, মা, মা, রক্ষা করা, মা! আমি আসছি মা!

বাসনা কেঁদে ফেলতেই পাশের ঘর থেকে ছুটে এল কবিতা। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বিষ্টুপদ, তারপর ডলি।

বিষ্টুপদ বলল, মাথায় থাবড়া দাও তো বউমা। স্বপ্ন আইটকে গিয়েছে! এক-এক সময় অমন আইটকে যায়।

কবিতা ভাবল, তারই নাকি ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে ওঠার রোগ আছে, সেজদার আবার হল কবে থেকে?

মনোরঞ্জন হাত জোড় করে বলে, যাচ্ছি, মা, মা, আমার অপরাধ নিয়ো না, মা! তোমার পায়ে আমার শত কোটি প্রণাম মা! তোমার পায়ে আমার শত কোটি প্রণাম মা! আমি আসছি মা।

একগাদা চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরে। তাতে দেখা যায় মনোরঞ্জনের দু'চোখ জলে ভাসছে।

ডলি ঘরে ঢুকে বলল, ও মনন, কী হয়েছে, অ্যাঁ? চক্ষু খোল, এই তো আমি! বালাই ষাট, তুই কেন অপরাধ করবি।

ডলি ভুল করে ভেবেছিল, ছেলে বুঝি কোনও কারণে তার কাছে ক্ষমা চাইছে। কিন্তু মনোরঞ্জন যাকে ডাকছে সেই এই মা নয়, আরও অনেক বড় ধরনের মা।

মনোরঞ্জন বিহ্বল ভাবে বলল, আমি বনবিবিকে দেখলাম গো, মা।

ও, স্বপ্ন দেইখেছিস। একবার উঠে দাঁড়া।

স্বপ্ন নয়-গো, একেবারে চোখের সামনে। গাছতলা আলো করে দাঁড়িয়ে আছেন মা বনবিবি, পাশে দুখে, মা আমাকে বললেন, বাদার সমস্ত জোয়ান মরদ আমাকে একবার পুজো দেয়, তুই বিয়ে করলি, আজও আমাকে পুজো দিসনি!

বলতে বলতেই বিছানায় দু'হাত ছড়িয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে, যেন প্রবল যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে বুক ফাটা গলায় সে বলতে থাকে, আমি আসছি মা, আমার ভুল হয়ে গেছে মা, আমার অপরাধ নিয়ো না মা।

আবার সে হঠাৎ উঠে বসে বাসনার হাত চেপে ধরে বলে, মা বনবিবি আমাকে ডেকেছেন!

পরদিন সকালেই রটে গেল যে মনোরঞ্জন মা বনবিবিকে স্বপ্নে পেয়েছে।

সারা সকাল সে বিছানা থেকে উঠলই না, এমনই অবসন্ন হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে সে কাঁদে, মাঝে মাঝে শূন্যভাবে চেয়ে থাকে।

বিকেলে সাধুচরণ আর তার দলবল দেখতে এল তাকে। বারান্দায় উবু হয়ে চুপ করে বসে আছে মনোরঞ্জন, বিদ্যুৎ তাকে একটা বিড়ি এগিয়ে দিতেও সে খেল না। মায়ের পুজো না-দেওয়া পর্যন্ত সে আর বিড়ি খাবে না। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কথা বলারও কোনও উৎসাহ নেই তার।

সে-রকম জঙ্গল এখান থেকে এক জোয়ারের পথ। যখন তখন যাওয়া হয় না। নিরাপদ-বিদ্যুৎরা যখন পারমিট নিয়ে কাঠ কাটতে যাচ্ছেই, তখন মনোরঞ্জনও ওদের সঙ্গে ঘুরে

আসুক। পুজো দেওয়াও হবে, দুটো পয়সার সাশ্রয়ও হবে। স্বয়ং বিষ্টুচরণই দিল এই প্রস্তাব।

গোলা থেকে আরও এক বস্তা ধান এর মধ্যে বার করা হয়েছে। গোলাটায় এখন টোকা দিলে ঢ্যাপ ঢ্যাপ করে। সেই দিকে তাকিয়ে ডলিও আর কোনও আপত্তি করতে পারল না। তবু সে বার বার বাসনার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। একরত্তি কচি বউটা, তাকে ফেলে চলে যাবে! প্রথম সন্তান জন্মাবার আগে স্বামী-স্ত্রীর বেশি দিন ছাড়াছাড়ি থাকা ভাল নয়। এতে পুরুষ মানুষরা বার-মুখো হয়ে যায়।

সন্ধের সময় সে বাসনাকে জিজ্ঞেস করল, অ বউ, মনা তা হলে যাবে ওদের সঙ্গে? বাসনা সম্মতি সূচক ঘাড় হেলায়। ডলি তখন বলল, যাক তবে, ঘুরে আসুক, মা বনবিবি যখন ডেইকেছেন, এখন ঝড়-বৃষ্টি নেই, নদীতে ঢেউও তেমন তেজি নয়...।

বাসনাকে সে বলল, বউ, তোর সিঁদূরের কৌটোটা মনোকে দিয়ে দিস। মায়ের পাইয়ে ছুঁইয়ে নিয়ে আসবে।

সব ঠিকঠাক হয়ে যাবার পর যাত্রার আগের দিন রাত্রে মনোরঞ্জন বাসনার থুতনি ধরে বলল, বাসনা, আমার বাসনা, একবারটি হাসোনা!

বাসনা ফোঁস করেও উঠল না, হাসলও না। গম্ভীর হয়ে রইল।

মনোরঞ্জন বলল, মায়ের পুজো দিতে যাচ্ছি, এ-সময় কেউ অসৈরন করে? জঙ্গলে ভাল কাঠ পেলে আমাদের পার হেড শ'পাঁচেক টাকা উপরি রোজগার হবেই। তখন তোমার জন্য এটা শাড়ি...এখানে নয়। একেবারে কলকাতার দোকান থেকে..বুঝলে...।

অত বড় নৌকোতে পাঁচ জন বসলেও যেন খালি খালি দেখায়। মনোরঞ্জন উঠে বসায় তবু যেন খানিকটা মানানসই হল। হালে বসেছে মাধব, শালবাহু নিয়ে মনোরঞ্জন ধরল একটা দাড়। মনোরঞ্জনকে নিতে মাধব আপত্তি করেনি, কারণ এ ছেলেটাকে দিয়ে কাজ

হবে সে জানে। যেবার কালীবচকের কাছে ডাকাতের পাল্লায় পড়েছিল মাধব, সেবার যদি এই মনোরঞ্জনের মতো আর একটা মানুষও থাকত তার পাশে তাই হলে লগি পিটিয়ে ডাকাতদের ঠাণ্ডা করে দিতে পারত।

সব সরঞ্জাম তোলা হয়েছে, ওদের বিদায় দিতে এসেছে অনেকে। একমাত্র বিদ্যুৎ শুধু জামা গায় দিয়েছে, আর সবাই খালি গায়ে তৈরি, গণ লেগেছে, এই তো যাত্রার পক্ষে শুভ সময়। নৌকো ছাড়তেই ডলি চেঁচিয়ে বলল, মামুদপুরের পাশ দিয়েই তো যাবি, একবার বউমার বাপের বাড়িতে দেখা করে যাস।

আচ্ছা!

সিঁদূরের কৌটোটা...মনে থাকে যেন।

বাঁধের ওপর অন্যদের জটলা থেকে একটু দূরে একটা নিমগাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাসনা। মনোরঞ্জন সে-দিকে তাকিয়ে হাসল। সেই হাসি দেখে ধক করে উঠল বাসনার মুখটা। কী অদ্ভুত হাসি। মন-খোলা মানুষ মনোরঞ্জনকে সে অনেক রকম ভাবে হাসতে দেখেছে, ভাস্কর পণ্ডিত কিংবা খিঁজির খাঁ রূপী মনোরঞ্জনের অট্টহাসিও সে শুনেছে, কিন্তু এরকম হাসি তো সে কখনও দেখেনি। চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে মনোরঞ্জনের, কেমন যেন স্থির দৃষ্টি, ঠোঁট অল্প একটু ফাঁক করা।

কাল রাতে বেশি কথা হয়নি, খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিল মানুষটা। আজ সকাল থেকেও নানা কাজে ব্যস্ত। একটুখানির জন্যও বাসনা তার স্বামীকে আড়ালে পায়নি। তাই কি মনোরঞ্জন ওই রকম হাসি দিয়ে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতে চায়? কোনও মানুষ একেবারে নতুন ভাবে হাসতে পারে!

একটু পরেই নৌকোটা সামনের ট্যাঁক ঘুরে চোখের আড়ালে চলে গেল।

.

তিন বন্ধুর উপাখ্যান

জয়মণিপুরে টেলিফোন আছে।

বিদ্যুতের আলো নেই, নদী পেরিয়ে মোটরগাড়ি আসার কথা তো দূরে থাক, ঠিকঠাক গোরুর গাড়িরও রাস্তা নেই। ফুড ফর ওয়ার্কও এই জলা-অঞ্চল চেনে না, তবু এখানে টেলিফোন থাকে কী করে? আছে, আছে। বিজ্ঞানের অবদান। বিজ্ঞানের মন ভাল থাকলে টেলিফোন ঝিলিনিং ঝিলিনিং করে বাজে, আবার বিজ্ঞান ভুলে গেলে, দু-তিন মাস টেলিফোনের ঘুম।

রাত পৌনে এগারোটায় কো-অপ অফিসে টেলিফোন বেজে উঠল।

এই দো-তলা মাঠকোঠাখানির একটা ঘরে বদন দাস শোয়। তার মানে এই নয় যে বদন দাস এই অফিসের দিন-রাতের কর্মী। সেরকম কেউ নেই। বদন দাসের বাড়িতে লোক অনেক, জায়গা কম, তাই সে রাত্রে এখানেই থাকে। তারও শোওয়া হল আর অফিস ঘরটা পাহারা দেওয়া হল।

ঘুম থেকে উঠে টেলিফোন ধরে বদন দাস ও-পারের কথা কিছুই বুঝতে পারল না। সে-ও হ্যালো হ্যালো বলে, ও-পার থেকেও হ্যালো হ্যালো। তখন সে বলল, আপনি ধরেন স্যার, আপনি ধরে থাকেন, আমি মাস্টারমশাইকে ডেকে আনতেছি।

মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি পাঁচ-সাত মিনিটের পথ। বদন দাস প্রথমে টর্চ খুঁজে পায় না। এমনই অভ্যেস যে টর্চ ছাড়া রাত্রে বাইরে বেরুতেই পারে না। বালিশের পাশে রাখা ছিল, টর্চটা কখন গড়িয়ে পড়ে গেছে খাটের নিচে।

সারা দিন গরম, কিন্তু রাতের হাওয়ায় এখনও সিরসিরে ভাব। প্রথম বর্ষণের আগে সাপগুলো সাধারণত গর্ত থেকে বেরোয় না। তবে অভ্যেসবশত পায়ে ধপ ধপশব্দ করে

বদন দাস। আর আপন মনে একটা গান গুনগুনোয়, কথা কয়ো না। শব্দ করো না। ভগমান নিদ্রা গিয়েছেন, ভগমান নিদ্রা গিয়েছেন, ভগমান নিদ্রা গিয়েছেন...।

মাস্টারমশাইয়ের কোয়ার্টারে আলো জ্বলছে দেখে বদনের অস্বস্তি চলে যায়। উনি অনেক রাত জেগে বই পড়েন। পড়াশুনা শেষ করে মানুষ চাকরি করতে যায়। তার পরও কারুর রাত জেগে পড়াশুনো করার মন থাকে? বিচিত্র! ভগমান নিদ্রা গিয়েছেন, ভগমান নিদ্রা গিয়েছেন, কথা কয়োনা। গোসাবায় এসেছিল কলকাতার থিয়েটার পার্টি। একবার শুনলেই গানের সুর মনে থাকে বদনের।

মাস্টারমশাই, মাস্টারমশাই।

কো-অপারেটিভের মেয়েদের তাঁতে বোনা লুঙ্গি পরে বেরিয়ে এসে পরিমল মাস্টার জিজ্ঞেস করলেন, কী রে?

বদন দাসের মুখে টেলিফোনের বৃত্তান্ত শুনেই পরিমলমাস্টারের বুকের মধ্যে দু-চার লহমার জন্য ঢাকের শব্দ। প্রথম প্রতিক্রিয়াটা ভয়ের। তারপর প্রত্যাশার।

পাঞ্জাবিটা গায়ে চাপাবার কথা ভুলে গিয়ে শুধু হাওয়াই চটি পায়ে গলিয়ে তিনি বললেন, চল।

কোয়ার্টারের সামনের কঞ্চির গেটে হাত দিয়ে তিনি আবার থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, একটু দাঁড়া।

ফিরে গিয়ে চার্লি চ্যাপলিনের মতো দ্রুততম ভঙ্গিতে খাটের তলা থেকে টেনে বের করলেন একটা লোহার তোরঙ্গ। তার ডালাটা খুলে ভেতরের অনেক কাগজপত্রের মধ্যে হাত চালাতে লাগলেন অন্ধের মতো। সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই।

বাক্সটা বন্ধ করে খাটের তলায় আবার ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই দেখলেন, মাঝখানের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর স্ত্রী সুলেখা।

সব কিছু ব্যাখ্যা করে বোঝাবার সময় নেই বলে তিনি, টেলিফোন এসেছে, বলেই দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন।

পাঁচ দিন আগে কঠোর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সিগারেট ছেড়ে দেবেন। তখন প্যাকেটে ছ'টা সিগারেট। প্রথমে ভেবেছিলেন প্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দেবেন খালের জলে, তারপর ভাবলেন পয়সা দিয়ে কেনা জিনিস নষ্ট না করে ভূগোলের টিচার বিনোদবাবুকে দিয়ে দিলেই তো হয়। তা-ও দেননি। বাড়িতে সিগারেট নেই, পকেটে সিগারেট কেনার পয়সা রাখবেন না বলেই সিগারেট খাওয়া হবে না। এর মধ্যে বীরত্বের কিছু নেই। সিগারেট আছে তবু খাচ্ছেন না, এটাই আসল পরীক্ষা। সেই জন্যই টিনের তোরঙ্গের মধ্যে।

কিন্তু এই সব সংকটের সময় একটা সিগারেট না থাকলে বড় অসহায় লাগে।

মেয়ে থাকে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের হস্টেলে। ছেলে ডাক্তারিতে ভর্তি হবার জন্য পরীক্ষা দেবে, তাই আছে মামাবাড়িতে। ওদের কারুর কোনও বিপদ হয়নি তো? প্রথমেই মনে আসে এই কথা।

কে টেলিফোন করেছে নাম বলেনি?

বুঝলাম না মাস্টারমশাই। খালি একনাগাড়ে হ্যালো হ্যালো, আর বললে এক্ষুনি মাস্টারমশাইকে ডেকে আনো, ঘুমিয়ে পড়লেও ডেকে তুলবে। সেই জন্যই তো এত রাতে আমি ছুটে এলুম। কটা বাজে এখন মাস্টারমশাই!

এগারোটা হবে।

এত জরুরি ডাক শুনেই আশা-নিরাশার ধন্ধ। এক লাখ সত্তর হাজার টাকার একটা স্কিম দিয়েছিলেন সরকারকে, সেটা পাশ হয়ে গেছে? গত মাসে রাত সাড়ে'ন'টার সময় এক জন টেলিফোন করে জানিয়েছিল যে চিফ সেক্রেটারি তার পরদিন এ-দিকে আসবেন। সেই রকম কেউ? জেনিভাতে কো-অপারেটিভ মুভমেন্টের ওপর একটা সম্মেলন হচ্ছে,

কে যেন বলছিল, জয়মণিপুরে এত ভাল কাজ হচ্ছে পরিমল মাস্টারের যাওয়া উচিত...টেলিগ্রাম অফিস থেকে অনেক সময় টেলিফোনে খবর জানায়...ছোট শ্যালিকা মিতুন রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছে। খোকন বা মিতুর হঠাৎ কোনও অসুখ...।

তুই কী গান গাইছেস রে বদন? ভাল করে কর তো।

কথা কয়ো না, শব্দ করো না, ভগমান নিদ্রা গিয়েছেন, ভগমান নিদ্রা গিয়েছেন..আর কথাগুলো মনে নেই মাস্টারমশাই।

বেশ ভাল গান তো! পুরোটা শিখলি না? তুই আর একটা কী যেন গান গাস, সোনার বরণী মেয়ে –।

সোনার বরণী মেয়ে, বলো কার পথো চেয়ে, আঁখি দুটি ওঠে জলে ভরিয়া- আ আ আ।

কাঠের সিঁড়িতে ধুপ ধুপ শব্দকরে দু'জনে উঠে এল ওপরে। পরিমল মাস্টার সবরকম উত্তেজনা দমন করে যত দূর সম্ভব শান্ত ভাবে বললেন, হ্যালো।

কোনও উত্তর নেই। লাইনও কাটেনি। ও-পাশে ঝন ঝন ঝ্যাঁকে ঝ্যাঁকো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বিলিতি বাজনা।

পরিষ্কার বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠল তাঁর কপালে।

তিনি হ্যালো হ্যালো বলে যেতে লাগলেন। নিজের উপস্থিত বুদ্ধি সম্পর্কে ঈষৎ গর্বের ভাব আছে পরিমল মাস্টারের। তিনিও ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না। দেরি দেখে, যে টেলিফোন করছিল সে রিসিভারটা রেখে অন্য কোথাও গেছে। কিন্তু কে এবং কোথা থেকে? সুন্দরবনের এই নিশুতি পাড়াগাঁয়ে যন্ত্র মারফত ওই বাজনার শব্দ যেন মনে হয় অন্য কোনও গ্রহ থেকে আসছে।

এবার ও-দিক থেকে কেউ রিসিভার তুলে বলল, হ্যালো, কাকে চান?

এবার রাগ হল পরিমল মাস্টারের। তিনি কড়া গলায় বললেন, আমি কারুকে চাই না। আমাকে কেউ একজন টেলিফোনে ডেকেছে? আপনি কোথা থেকে ।

ধরুন!

আরও একটু পরে ও-পার থেকে কেউ এক জন প্রচণ্ড চিৎকার করে বলতে লাগল, হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো।

আপনি কাকে চাইছেন?

কে, পরিমল? বাপ রে বাপ, এতক্ষণ লাগে? আমি অরুণাংশু বলছি...।

পরিমল মাস্টারের বুক খালি করা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

কলকাতা শহরতলির একই স্কুলে, একই ক্লাসে, একই বেঞ্চিতে বসে পড়ত তিন বন্ধু। ক্লাস সেভেন থেকে এক সঙ্গে। সুশোভন, অরুণাংশু আর পরিমল। অরুণাংশু অত্যন্ত লাজুক, সুশোভন জেদি আর দলপতি ধরনের, পরিমল টিপিক্যাল ভাল ছাত্র। সে কত কাল আগেকার কথা। ত্রিশ বত্রিশ বছর তো হবেই। স্বভাবে আলাদা আলাদা হলেও ওই তিনটি স্কুলের বন্ধু ছিল একেবারেহরিহর আত্মা। স্কুলে সিরাজদ্দৌল্লা নাটকের অভিনয় হল, সুশোভনই তার নায়ক এবং পরিচালক। পরিমল লর্ড ক্লাইভ, কারণ তার রঙ ফরসা আর ইংরেজি উচ্চারণ ভাল। অরুণাংশুকে দেওয়া হয়েছিল সামান্য দূতের পাঠ, তা-ও সে পারেনি, রিহার্সালেই নাকচ।

সময় মানুষকে কত বদলে দেয়? সেইসুশোভন, অরুণাংশু আর পরিমল এখন কোথায়। ম্যাট্রিকে স্টার এবং স্কলারশিপ পেয়েছিল পরিমল, সুশোভন কোনওক্রমে ফার্স্ট ডিভিশন আর অরুণাংশু সেকেন্ড ডিভিশন। কলেজে এসে তিন বন্ধুর ছাড়াছাড়ি। অরুণাংশু মণীন্দ্র কলেজে পড়তে গেল সায়েন্স নিয়ে। সুশোভনও সায়েন্স, কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজে। আর যে-সব কলেজে ছেলে আর মেয়ে এক সঙ্গে পড়ে, সে-রকম কোনও কলেজে পরিমলের

পড়া হল না, তার বাবার আপত্তি। তাই স্কলারশিপ পেয়েও সেস্কটিশ বা প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হল না, সে আর্টস পড়তে গেল সুরেন্দ্রনাথে।

যার যেখানেই কলেজ হোক, প্রত্যেকদিন বিকেলবেলা তিন বন্ধুর দেখা হবেই কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে।

ইন্টারমিডিয়েটের পর সুশোভন গেল শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে, অরুণাংশু কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিকালে ফেল করে আত্মহত্যা করতে গেল। তাতেও ব্যর্থ হয়ে এবং কোনও রকমে কম্পার্টমেন্টালে পাশ করে অরুণাংশু কলেজ বদলে সেন্ট পলসে এল, বি.এসসি পড়তে। আই এ-তে বাংলা ও ইংরেজি দুটোতেই ফার্স্ট হয়ে পরিমল সিটি কলেজে ফ্রি ছাত্র হিসেবে বি.এ.-তে ইকনমিকসে অনার্স নিল।

এই তিন ছাত্রের জীবনের গতি কোন দিকে যাবে, তা এই সময়েও ঠিক করে বলা, কোনও জ্যোতিষী কেন, বিধাতারও অসাধ্য ছিল।

যেবার অরুণাংশু আত্মহত্যা করতে যায় সেবারই অরুণাংশুর প্রথম কবিতা ছাপা হয়, পরিচয় পত্রিকায়। পরিমল তখন থেকেই রাজনীতির দিকে ঝোঁকে। আর প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢোকার পর থেকে সুশোভন বড়লোকের মেয়েদের পেছনে ঘোরাঘুরি অভ্যেস করে এবং নিজের সাজপোশাকের প্রতি অত্যধিক নজর দেয়। নিজের ডিজাইনে দর্জির কাছ থেকে বানানো নিত্যনতুন কায়দার শার্ট তার গায়ে।

কোনওক্রমে বি.এসসি পাশ করে, কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে অরুণাংশু কাজ নিল এক কারখানায়, যে-কারখানার নামে তখন ব্রিটিশ গন্ধ। এম.এ-তে পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র পরিমল তখন ছাত্র নেতা, সুশোভন হবু-ইঞ্জিনিয়ার এবং ডন জুয়ান। পরিমলের মধ্যে প্রেমিকের ভাব কখনও দেখা না গেলেও সিক্সথ ইয়ারে উঠেই সে গোপনে বিয়ে করে সহপাঠিনী সুলেখাকে। তার বিয়ের সময় ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র অনুপস্থিত ছিল অরুণাংশু, সে তখন দ্বিতীয় বার আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে এবং কারখানার চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তেমন কিছু কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি সুশোভন, কয়েক বছর এখানে ওখানে অভিজ্ঞতা কুড়িয়ে সে চলে যায় নাইজিরিয়ায়। তার মধ্যেই অরুণাংশুর পর পর তিনটি কবিতা ‘দেশ’ পত্রিকায় ছাপা হয়ে রীতিমতো সাড়া জাগিয়েছে। শত শত কবিদের মধ্যে থেকে এক লাফে ওপরে উঠে এসেছে অরুণাংশু। বিনীত ও লাজুক অরুণাংশুর সে-সময়কার কবিতার বৈশিষ্ট্য ছিল অত্যন্ত হিংস্র ও অসভ্য শব্দ ব্যবহার। এম.এ ফাইনাল পরীক্ষা দেবার আগেই সুলেখার সঙ্গে জেলে যায় পরিমল, জেলে বসেই সে অরুণাংশুর কবিতা পড়ে অবাক হয়েছিল। বাংলায় কোনও দিন ভাল নম্বর পায়নি অরুণাংশু, সে এমন কবিতা লিখতে পারে?

সুশোভন আর অরুণাংশুকে এখন বাংলার সকলেই এক ডাকে চেনে। বাংলা ছাড়িয়ে আরও দূরে গেছে তাদের খ্যাতি। অরুণাংশুর জীবনযাপনের নানা সত্য-মিথ্যে কাহিনি লোকের মুখে মুখে ঘোরে, কোথায় সেই লাজুক কিশোর, এখন সে দারুণ উগ্র ও অহঙ্কারী, কথায় কথায় সে লোকের সঙ্গে মারপিট বাধায় এবং মদ্যপানের রেকর্ডে ইতিমধ্যেই সে মাইকেলকে ছাড়িয়ে গেছে। যারা তার কবিতার ভক্ত, তারাই তার হাতে মার খেতে ভালবাসে।

নাইজিরিয়ায় গিয়ে সুশোভন প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে একটা শৌখিন নাটকের দল গড়েছিল। ভারতে ফিরে এল সে পুরোপুরি নাট্যকার হিসেবে। বেতার নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে সে প্রথমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপর সে গড়ল নিজের দল। এখন সে প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের পুরোধা। সুশোভনের পরিবর্তন আরও বিস্ময়কর। সেই উৎকট সাজপোশাকে আগ্রহী, ডন জুয়ানের সামান্য চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না তার মধ্যে, স্ত্রী ও দুটি সন্তান থাকলেও সুশোভন এখন অনেকটা যেন গৃহী-সন্ন্যাসীর মতো, খদ্দেবের পাজামা ও পাঞ্জাবি ছাড়া কিছু পরে না, নাট্য প্রযোজনার অবসরে বা অবসর করে নিয়ে সে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় দেশের মানুষের সমস্যার গভীরে পৌঁছবার জন্য, তার কথাবার্তার মধ্যেও ফুটে ওঠে ব্যাকুল অনুসন্ধানীর সুর। শান্তিগোপালের যাত্রাদল যেবার রাশিয়ায় যায় নিমন্ত্রণ পেয়ে, সেবারই এক সেবা সংস্থার আমন্ত্রণে সুশোভন তার

পুরো নাটকের দল নিয়ে ঘুরে এল আমেরিকা ও কানাডায়। তার সাম্প্রতিক নাটকটিতে ছিল ধনতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন দেশের প্রতি সমালোচনা ও কঠিন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ।

পরিমলের বাবার খুব আশা ছিল যে ছেলে আই.এ.এস পরীক্ষা দেবে। পরিমল জেল খেটে আসায় সে-সম্ভাবনা ঘুচে গেল, তার ওপরে আবার ছাত্র অবস্থাতেই অসবর্ণ বিয়ে। এ-সবের জন্য পরিমলের বাবার ধরল কথা-না-বলা রোগ। পরের বছর পরিমল এম এ-টা পাশ করে। পরিমল আর সুলেখা বাসা ভাড়া করল বরানগরে, বেহালার একটি কলেজে পরিমল যোগ দিল লেকচারার হিসেবে, আর দক্ষিণেশ্বরের একটা স্কুলে সুলেখা। তবে রাজনীতির সঙ্গে সুলেখা জড়িয়ে রইল বেশি করে। দ্বিতীয় বার গর্ভবতী অবস্থায় একাই জেলে গিয়ে সুলেখা ছাড়া পায় ঠিক তার প্রথম সন্তানের জন্মের দেড় মাস আগে।

একই স্কুলের এক ক্লাসের এক বেঞ্চের তিন জন ছাত্রের মধ্যে এক জন খ্যাতিমান নাট্যকার ও পরিচালক, অন্যজন বিশিষ্ট কবি। অথচ বাংলায় সব চেয়ে ভাল ছাত্র ছিল পরিমল। সে লেখার দিকে না গিয়ে অন্তত কোনও মন্ত্রী বা লোকসভা কিংবা বিধানসভায় বিরোধী দলের উল্লেখযোগ্য নেতা হলেও মানানসই হত। কিন্তু পরিমল সে-দিকে গেল না।

সক্রিয় রাজনীতি করার বদলে পরিমল আস্তে আস্তে হয়ে উঠল তাত্ত্বিক। সে পড়ুয়া মানুষ, মিছিলে গিয়ে চিৎকার কিংবা মাঠে গিয়ে আগুন ঝরা বক্তৃতা দেওয়ার চেয়ে সে ঘরোয়া বৈঠকে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতেই ভাল পারেও ভালবাসে। তাত্ত্বিকরা থাকে পেছনের দিকে, ক্যাডাররা সকলে তাদের চেনে না। তবু এই অবস্থাতেই পরিমল সন্তুষ্ট ছিল। সুলেখা তো অন্তত প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আছে।

ভেতরে ভেতরে কবে যে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে তা পরিমল নিজেও ঠিক টের পায়নি প্রথমে।

সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করার পর দুটি ব্যাপারে গুপ্ত কাঁটার মতো পরিমলকে সর্বক্ষণ একটু একটু পীড়া দিত। বরানগর থেকে সেই বেহালায় কলেজে পড়াতে যাওয়া। এই

যাতায়াতে শুধু সময় নয়, জীবনীশক্তিরও অনেকটা খরচ হয়ে যায়। প্রতি দিনের বিরক্তি। অথচ বাড়ি পালটানো যায় না নানা কারণে। বরানগরের বাড়ি থেকে সুলেখার স্কুল কাছে। সুলেখার বেশি সময় দরকার। অনেক চেষ্টা করে নিজের জন্য চাকরি জোটাবে, সেরকম মানুষই পরিমল নয়। তাছাড়া, এম.এ-তে তার রেজাল্টও ভাল হয়নি, সাধারণ সেকেন্ড ক্লাস। সুলেখা তো আর এম.এ পরীক্ষা দিলই না।

বাড়িটা বদলানো দরকার ছিল নানা কারণে। কিন্তু এ-দেশে চাকরিজীবীদের সন্তান জন্মালে আয় বৃদ্ধি হয় না, যদিও খরচ বেড়ে যায়। মিতু আর খোকন তখন জন্মে গেছে। বাড়ি পালটানো মানেই বেশি ভাড়া। প্রফুল্ল সেনের আমলে ডামাডোলের সময় কলকাতার বাড়ি ভাড়া দ্বিগুণ হয়ে গেল, তারপর লাফাতে লাগল তিনগুণ চারগুণের দিকে।

দুখানা ঘর, একটা বারান্দা, আলাদা বাথরুম, রান্নাঘর, দো-তলায় মোটামুটি ভোলামেলা, ভাড়া একশো পঁচাত্তর, ছাড়লেই অন্তত চারশো। ও-বাড়ির বাড়িওয়ালা অবশ্য পরিমলদের উঠিয়ে দেবার জন্য কোনও চক্রান্ত করেনি, লোকটা জানত যে ওই স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই রাজনীতি করে, ওদের পেছনে জোর আছে। তবু ওই বাড়িওয়ালার জন্যই পরিমলের মনে হত, আঃ, যদি এ বাড়িটা ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া যেত। লোকটির অন্য কোনও দোষ নেই, দেখা হলে হেসে কথা বলে। তবু, ওই ব্যক্তিটি অসম্ভব রকম অমার্জিত। যখন তখন পরিমলের সামনেই লোকটা ফ্যাঁৎ করে সিকনি ঝাড়ে, ওয়াক ওয়াক শব্দ তুলে গয়ের ফেলে, এক তলায় উঠোনে খোলা নর্দমার কাছে দাঁড়িয়ে বাঁ-দিকের ধুতি ঊরু পর্যন্ত তুলে পেচ্ছাপ করে।

সুলেখা এ-সব গ্রাহ্য করে না, কিন্তু পরিমল কিছুতেই সহ্য করতে পারে না এমন অমার্জিত কোনও মানুষকে। লোকটা তার নিজের বাড়ি নোংরা করছে, তাতে তার বলারই-বা কী আছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকটি কদর্য অশ্লীল ভাষায় অন্যদের সঙ্গে কথা বলে। সব নাকি রসিকতা। কিছু বলতে পারত না বলেই পরিমলের বেশি কষ্ট। তার সব সময় ভয়, যদি তার ছেলে মেয়েরা এসব দেখে শেখে।

সুলেখার সময় কম বলে পরিমলই বেশি নজর রেখেছিল মিতু আর খোকনের ওপর। সময় পেলেই সে ওদের নিয়ে পড়াতে বসেছে। সে জানত, মাস্টার-দম্পতির পুত্র-কন্যা, ওরা যদি ভাল রেজাল্ট না করে স্টাইপেন্ড স্কলারশিপ না পায়, তাহলে ওদের বেশি দূর পড়ানো সম্ভব হবে না। বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে শুধু মুখই করে, এই স্লোগান তখন উঠতে শুরু করেছে, তত্ত্বের দিক থেকে একথা পরিমল মানেও বটে, কিন্তু তার ছেলে মেয়েদের স্কুল ছাড়িয়ে পড়া বন্ধ করে দেবার কথা সে চিন্তাও করতে পারে না। এই বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থার এক-একটি যন্ত্র হয়েই তো সে আর সুলেখা জীবিকা সংগ্রহ করছে।

শুধু বেহালার দূরত্ব বা বাড়ি না পালটাবার জন্যই নয়, ভেতরে ভেতরে অন্য ভাবেও ক্ষয় হচ্ছিল পরিমল। দলের বৈঠকে নীরস তাত্ত্বিক আলোচনাতেও সে এক সময় ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। এর চেয়ে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো অনেক ভাল। মাটিতে পা দিয়ে হাঁটা, নদীর ধারে বা গাছতলায় বসা মানুষকে তার নিজের পরিবেশে পাওয়া।

বিবাহিত জীবনের এগারো বছর পূর্ণ হবার পর পরিমল এক দিন অপ্রত্যাশিতভাবে সুলেখাকে জিজ্ঞেস করল, সুন্দরবনের জয়মণিপুরে একটা কো-এড হাইস্কুলের দু'জন টিচারের চাকরি খালি আছে, তুমি যাবে?

পাঁচ মিনিট কথা বলেই সুলেখা অনেকটা বুঝে ফেলল। স্বামীর মনের এই নিঃস্বতার দিকটির সন্ধান সেবিশেষ নেয়নি। সে পালটা প্রশ্ন করল, তুমি পারবে?

ইন্টারভিউ দিতে গেল দুজনেই। সেই প্রথম ক্যানিং থেকে লঞ্চে চেপে ওদের সুন্দরবন দেখা। অনেকটা যেন বেড়াতে যাবার ভাব। স্বামী-স্ত্রীতে একসঙ্গে বেড়াবার সুযোগ এ-রকম বিশেষ হয়নি। গোসাবার ভাতের হোটেলের গরম গরম ভাত আর পাতলা মাঝের ঝোল খেতেও খুব মজা লেগেছিল। অসুবিধে হল পরিমলকে নিয়ে। স্কুলের এম.এ পাশ শিক্ষকরা কলেজে সুযোগ নেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে, আর পরিমল কলেজ ছেড়ে স্কুলে আসতে চায় কেন? স্কুলে রাজনীতি ঢোকার ব্যাপারে সবাই তখন চিন্তিত। অর্থাৎ সবাই সতর্ক, অন্য পার্টির লোক যাতে না ঢুকে পড়ে।

পরিমল জবাব দিয়েছিল, খুব ছেলেবেলায় আমি গ্রামে কাটিয়েছি, তারপর টানা পঁচিশ-তিরিশ বছর শহরে। এখন আমার আবার গ্রামে এসে থাকতে ইচ্ছে করে।

হেডমাস্টারমশাই সদাশিব ধরনের। অর্থাৎ ভালো মানুষ কিন্তু অকর্মণ্য। তিনি পরিমলের মুখের ভাব দেখে আন্দাজ করলেন, এই লোকটির কাঁধে অনেক ভারচাপানো যাবে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যখন আসতে চায়, তখন সহজে চলে যাবে না বলেই মনে হয়।

এ-দিকে আসতে চাইছেন কেন, বাদা অঞ্চলের মানুষজন চেনেন? থাকতে পারবেন এদের সঙ্গে? দখনে মানুষদের সম্পর্কে লোকে কী বলে জানেন না?

যেখানেই যাই, মানুষের সঙ্গেই তো থাকতে হবে।

গ্রাম ভালবাসেন, নেচার লাভার, কবিতা-টবিতা লেখেন নাকিমশাই?

ক্লান্তভাবে পরিমল বলেছিল, নাঃ, আমি জীবনে এক লাইনও কবিতা লিখিনি।

তারপর এখানে কেটে গেছে দশ বছর। এখন ক্যানিং থেকে মোল্লাখালি, এর মধ্যে পরিমল মাস্টারের নাম জানে না এমন কেউ নেই। মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করবার এতখানি শক্তি বা উৎসাহ যে তার মধ্যে নিহিত ছিল, পরিমল তা নিজেই জানত না। এখানেও লোকে ফড়াত করে সিকনি ঝাড়ে, শব্দ করে গয়ের তোলে, পেচ্ছাপ করে যেখানে সেখানে, তবুপরিমলের খারাপ লাগে না। অল্প চেনা লোককে তুই বলতে একটুও আটকায় না তার। এখানেও পোশাকের বাহুল্য নেই। মুখের ভাষাটাও বদলে নিয়েছে। প্রথম প্রথম লোকের মুখে নির্দোষী শুনলে বলত নির্দোষ বলো, অলসকে কেউ আয়েসী বললে তার কানে লাগত, আয়েসী মানে তো পরিশ্রমী। এখন এসব চুকে গেছে। এই যে বদন, ও কিছুতেই সমবায় বলবে না, সব সময় বলে সামবায়। পরিমল ওর পিঠ চাপড়ে বলে, ঠিক আছে, ওতেই চলবে।

কী ব্যাপার, অরুণাংশু? এত রাত্রে?

তোর ওখানে সুশোভন গিয়েছিল গত সপ্তায়? আমাকে বলিসনি কেন?

সুশোভন তো নিজে থেকে হঠাৎ এসেছিল।

শালা, আমাকে বাদ দিতে চাস?

কোথা থেকে কথা বলছিস?

পার্ক স্ট্রিট থেকে। সুশোভনের সঙ্গে তোর বেশি খাতির? ও-সব নাটক-ফাটক আমি গ্রাহ্য করি না। বঙ্গের গ্যারিক! একদিন একটা থাপ্পড় কষাব।

তুই কী বলছিস অরুণাংশু, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

এখানে আসবার পর প্রথম পাঁচ ছ বছর পরিমল কারুর সঙ্গেই যোগাযোগ রাখেনি। কলকাতায় গেলেও বন্ধুদের সঙ্গে পারতপক্ষে দেখা করত না। সকলের ধারণা হয়েছিল, সপরিবারে পরিমল অজ্ঞাতবাসে গেছে। রাজনৈতিক সহকর্মীরা দু-এক জন এখানে আসতে চাইলেও পরিমল বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি, এড়িয়ে গেছে। সুশোভনকেও ডাকেনি। কুমিরমারির হাটে সুশোভনের সঙ্গে এক দারুণ বৃষ্টিবাদলার সন্ধ্যায় হঠাৎ দেখা। সুশোভন নিজেই একা ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে পড়েছিল। দু'জনেই দুজনকে দেখে সবিস্ময়ে বলে উঠেছিল, আরে! যেন জঙ্গলের মধ্যে লিভিংস্টোন ও স্ট্যানলির সাক্ষাৎকার।

তারপর থেকে সুশোভন মাঝে মাঝেই আসে। দু-তিন দিনের জন্য গ্রামের মধ্যে হারিয়ে যায়, ফিরে এসে পরিমলের কোয়ার্টারে পুরো এক দিন ঘুমোয়। অরুণাংশুও একবার এসেছিল গত বছর, সেই সূত্র ধরে বেশ কয়েক জন সাংবাদিক। সুন্দরবনে বেড়াবার নামে দল বেঁধে শহুরে লোকের এখানে আসা পরিমল মাস্টারের একেবারেই পছন্দ নয়। ক্রমশ তার মনে এই বিশ্বাসটা দানা বাঁধছে যে, শহরের ছোঁয়াচটাই খারাপ।

পার্ক স্ট্রিটের আলোর রাজ্যে বসে অরুণাংশু বোধ হয় কল্পনাই করতে পারছে না যে এখানে একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ওখানে বাজছে বিলিতি বাজনা, এখানে ঘ্যা-ঘো-

ঘ্যা-ঘোশব্দে ডাকছে কোলা ব্যাঙ। মদের টেবিলে অরুণাংশুর বন্ধুরা এক সন্ধেবেলা যা খরচ করবে, তাতে এখানকার একটি পরিবারের এক মাস সংসার চলে যায়। একটি পরিবার নয়, দুটি পরিবার।

অরুণাংশু আরও কিছুক্ষণ টেলিফোনে রাগারাগি করল। তারপর ঘোষণা করল, আগামী রবিবার সে এখানে আসছে, মুরগি-ফুরগি কিচ্ছু চাই না, শুধু মাছ, টাটকা মাছ খাওয়ালেই হবে।

আপত্তি জানিয়ে কোনও লাভ নেই। বিখ্যাত লোকদের অনেক রকম যোগাযোগ থাকে, হয়তো অরুণাংশু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কোনও লঞ্চ নিয়ে এসে উপস্থিত হবে। অরুণাংশু তা পারে।

অরুণাংশু, তুই আসবি, খুব ভাল কথা, শুধু একটা অনুরোধ করব? সঙ্গে বেশি লোকজন আনিস না।

যদি বউ-বাচ্চা নিয়ে আসি?

তাহলে তো আরও ভাল। সুলেখা বলছিল–।

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! গুন্নাইট মাই বয়!

লাইন কেটে দিয়েছে অরুণাংশু। শেষকালে অমন হেসে উঠল কেন? এর মধ্যে হাসির কী খুঁজে পেল? পরিমল ভাবল, আমরা সবাই মধ্যবয়স্ক হয়ে গেছি, অরুণাংশুর মধ্যে খানিকটা ছেলেমানুষি রয়ে গেছে এখনও। কবিতা লিখতে গেলে, বা কিছু সৃষ্টি করতে গেলে বুকের মধ্যে বোধহয় শৈশব জাগিয়ে রাখতে হয়।

গত বছর এসে অরুণাংশু যেমন জ্বালিয়েছিল খুব, সে-রকম একটা ব্যাপারে অবাকও করেছিল।

অরুণাংশুর বায়নাক্কার শেষ নেই। সঙ্গে নিয়ে এসেছিল পাঁচ জনকে। দিনের মধ্যে দশ-বারোবার চায়ের হুকুম, তা ছাড়াও সর্বক্ষণ এটা চাই, ওটা চাই। গ্রামের একটি মাত্র দোকানে যা সিগারেট ছিল, তা মাত্র দু'দিনে অরুণাংশু বলতে গেলে একাই সব শেষ করে ফেলল, তারপর নৌকোয় করে একজন লোককে পাশের গ্রামের হাটে পাঠাতে হল সিগারেট আনবার জন্য। অরুণাংশু এখানে যাতে মদ্যপান না করে সেজন্য কাকুতি-মিনতি করেছিল পরিমল মাস্টার, কিন্তু অরুণাংশু শোনেনি, তার ওপর দুটো কাঁচের গেলাস ভেঙেছে, এবং খালি বোতলটা রাত্রির অন্ধকারে ফাঁকা মাঠ ভেবে ছুঁড়ে দিয়েছে মেয়েদের হস্টেলের কম্পাউন্ডে। এ-রকম মূর্তিমান উপদ্রব পরিমল মাস্টার এখানে চায় না।

ফিরে গিয়ে সুন্দরবনের গ্রামের পটভূমিকায় অরুণাংশু একটা ছোট গল্প লিখেছিল। সে-গল্পটা পড়ে পরিমলমাস্টার বিস্মিত না হয়ে পারেনি। একেবারে এখানকার গ্রামের নিখুঁত ছবি। সমস্যার খুব গভীরে সে ঢুকতে পারেনি হয়তো, সে-চেষ্টাও করেনি, কিন্তু চমৎকার ছবি ফুটিয়ে তুলেছে। অরুণাংশু গ্রামে ঘুরল না, লোকজনের সঙ্গে কথা বলল না, শুধু আড্ডা দিয়ে আর মদ খেয়ে চলে গেল, তবু সে এত সব পেল কী করে? তবে কি ওদের একঝলক দেখে নিলেই চলে? এরই নাম কি অন্তর্দৃষ্টি?

অরুণাংশুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার সময় অন্যমনস্কভাবে পরিমল মাস্টার প্যাকেটের সবকটা সিগারেটই শেষ করে ফেলেছে। এবার সে বদনকে বলল, একটা বিড়ি দে, বদন!

বদন বিড়ি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসব মাস্টারমশাই?

না রে পাগল! আমি ঠিক গান গাইতে গাইতে চলে যাব।

পরিমল মাস্টারের স্টকে একটিই মাত্র গান। আগুন আমার ভাই, আমি তোমারই জয় গাই। এক-এক সময় এই গানটাকেই সে প্রেম সঙ্গীতের মতো খুব ভাব দিয়ে গান, তখন তার চোখ দু'টি আধো-বোজা হয়ে যায়।

সুলেখা জেগে আছে। থাকবেই, কৌতূহল চেপে মানুষ ঘুমোত পারে না। সব শুনে সে বলল, এর থেকে খারাপ খবরও তো হতে পারত।

একবার সিগারেট খেতে শুরু করায় পরিমল মাস্টারের মুখ শুল শুল করছে আর একটা সিগারেটের জন্য। অথচ উপায় নেই, এখন যত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া যায়। পরিমল মাস্টার মশারি তুলে বিছানায় ঢুকে পড়ল আর সুলেখা গেল শিয়রের কাছে জানালাটা বন্ধ করতে।

তখনই সে শুনতে পেলেন কান্নার আওয়াজটা।

বাইরের অন্ধকারে নিঃসাড়ে পড়ে আছে পৃথিবী। আলো নেই, তাই কোনও ছায়া নেই, সেই জন্য কোনও কিছুর অস্তিত্বও নেই। এর মধ্যে কান্নার আওয়াজে কেমন যেন অপ্রাকৃত মনে হয়।

এক জন নয়, অনেকের কান্না। সুলেখা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনে মুখ ফেরাল।

কী?

কারা যেন কাঁদছে। এখন তো সাপখোপের দিন নয়।

মশারির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে একটু দ্বিধা করল পরিমল মাস্টার। জানলার কাছ থেকে। সরে এসে খুব কাতর গলায় বলল, আমার খুব ঘুম পেয়েছে, এত রাতে করবার কিছু নেই। জানলাটা বন্ধ করে দাও, আমি একটু ঘুমাই।

মাধবমাঝির বিবরণ

তুমি তো সঙ্গে ছিলে, মাধবমাঝি, তবু কেন এ- রকম হল?

মাধব মাঝি এমন উত্তেজিত যে তার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে, চোখ দু'টি অন্ধকারে বেড়ালের চোখের মতো, মাথার চুলগুলো খাড়া খাড়া, কথা বলতে গিয়ে তোতলাচ্ছে।

আমি...আমি... শালা, বাপের জন্মে এমন কাণ্ড দেখি নাই, কখনও শুনি নাই। কেউ.. আমরা কেউ দ্যাখলাম না, একটা পাতা পড়ার শ-শ শব্দ শুনলাম না, আর একটা মানুষ মইধ্যখান থিকা...

মধুভাঙতে, কাঠ কাটতে যে-দলটি গিয়েছিল জঙ্গলে, তারা অসময়ে ফিরে এসেছে। মাধব ছাড়া আর বাকি ক'জন মাটিলেপা দেয়ালের মত মুখ করে বসে আছে ঠায়। কাঁদছে ডলি, কবিতা, বাসনা আর প্রতিবেশীদের কয়েকটি স্ত্রীলোক। মনোরঞ্জন ফেরেনি।

এত রাতেও নাজনেখালির মাতব্বর ব্যক্তিরা এসে জড়ো হয়েছে এ বাড়িতে। এ-রকম সংবাদ শুনলে সবাই আসে। একেবারে শেষে এল নৌকোর মালিক মহাদেব মিস্তিরি। প্রত্যেক বার নতুন করে বিবৃত হচ্ছে পুরো কাহিনি। পুরুষরা কেউ কাঁদে না, কারণ এমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, সুন্দরবনের আসল জঙ্গলে গেলে এক-আধ জনকে বাঘের মুখে পড়তে হবে, এতে অবার হবার কী আছে? যারা চোরাই কাঠ আনে, তাদের সঙ্গে কারবার আছে মহাদেব মিস্তিরির। এই তো গত মাসেই সে-রকম একটা দলের রফিকুল মোল্লা খতম হয়ে গেল। নাড়িভুড়ি বার করা অবস্থা রফিকুল মোল্লার লাশ নামানো হয়েছিল ন্যাজাট জেটিতে। গোসাবার কাছে একটা গ্রামের নামই বিধবা গ্রাম হয়ে গেছে না? কাঠ কাটা কেন, যত জেলে মাছ ধরতে যায়, তারা সবাই কি ফেরে?

কিন্তু এরা তো গিয়েছিল পারমিট নিয়ে, আইনসম্মত ভাবে। বাঘ বুঝি আইন মানে, পারমিট থাকলে কাছে ঘেঁষে না, সে-কথা হচ্ছে না। সুন্দরবনের কাঠ কেটে সুন্দরবনের

অর্ধেক মানুষের পেট চলে। অথচ জঙ্গল কেটে সাফ করে ফেললে বাঘ বাঁচবে কী করে? আমাদের ভবিষ্যৎবংশধররা বাঘ দেখবে না? সেই জন্য তৈরি হয়েছে টাইগার প্রজেক্ট। সরকার বিভিন্ন জঙ্গলের বিশেষ বিশেষ অংশ 'কোর এরিয়া' বলে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। সেখানে শুধু বাঘ থাকবে, মানুষের প্রবেশ নিষেধ। বাকি জঙ্গলে পারমিট নিয়ে যার খুশি কাঠ বা মধু আনতে যাক না! চুরি করে কাঠ কাটতে গেলে তো ধরা পড়লে নৌকো বাজেয়াপ্ত হবেই, জেলও খাটতে হবে। যে-কোনও চুরিরই শাস্তি আছে। কার জিনিস কে চুরি করছে, সে আলাদা কথা!

একটা ছোটখাটো পাহাড়ের মতো চেহারা মহাদেব মিস্তিরির। পয়সার জোর, বন্দুকের জোর আর গায়ের জোর আছে বলেই না লোকে তাকে মানে। তবে নিজের গ্রামের লোকের রক্ত শুষে সে টাকা বানিয়েছে, এমন অপবাদ তাকে কেউ দিতে পাবে না। তার চালের ব্যবসা, কাঠের ব্যবসা সবই বাইরের লোকের সঙ্গে।

মহাদেব মিস্তিরিকে দেখে কবিতা কাঁদতে কাঁদতেই একখানা চাটাই এনে উঠোনে পেতে দিল। মহাদেব মিস্তিরি মাধব মাঝির সামনে গ্যাট হয়ে বসল, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। গাঁজার কল্কে টানার মতো হাত মুঠো করে সিগারেট টানলে তার আঙুলের চারটি আংটি দেখা যায়।

ছেলে-ছোকরাদের না হয় মাথা গরম, কিন্তু মাধব, তুমি তো পোড় খাওয়া মানুষ। তুমি কী বলে এমন আহাম্মকি করলে?

আপনে, আপনে বিশ্বাস করেন মহাদেবদা, ঠাকুর ফরেস্টে আমি আগে কতবার গেছি, কোনও দিন কিছু হয় নাই ।

ঠাকুর ফরেস্টে বাঘ? তুমি বলো কী মাধব? সেখানে তো একটা শিয়ালও নেই।

দয়াপুরে বাঘ আছে? ছোট মোল্লাখালিতে বাঘ আসে ক্যামনে, আপনে আমারে কন তো? আসে নাই সেখানে বাঘ?

মিস্তিরি সম্প্রদায়ের সকলেই বৈষ্ণব। মহাদেবের গলায় কণ্ঠী আছে। হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে মহাদেব বলল, শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু! ছোট মোল্লাখালিতে যে-দিন বাঘ আসে, সে-দিন সেখানে মহাদেব উপস্থিত। হাটের কাজকর্ম সেরে সে রাত্তিরে-রাত্তিরেই নৌকোয় উঠেছিল। ভাবলে এখনও গা শিউরে ওঠে যে, তার নৌকোর পাশ দিয়েই বাঘটা সাঁতরে গিয়েছিল ছোট মোল্লাখালির দিকে।

আসল কাহিনি ভুলে গিয়ে সকলে কিছুক্ষণের জন্য ছোট মোল্লাখালির সেই বাঘ আসার দিনটির গল্পে মগ্ন হয়। দয়াপুর গ্রামের বাঘটাকে তো ধরে নিয়ে রাখা হয়েছে কলকাতার চিড়িয়াখানায়। কী যেন একটা শখের নাম রাখা হয়েছে সেই বাঘটার, দয়ারাম না সুন্দরলাল?

কাঁদতে কাঁদতে একটু থেমে গিয়ে ডলি হঠাৎ দাঁত কিড়মিড় করে বাসনাকে বলল, রাক্ষুসী, তুই-ই তো আমার ছেলেটাকে খেলি। হারামজাদিবিয়ের পর এখনও বছর ঘোরেনি, এরমধ্যে কেউ সোয়ামিকে জঙ্গলে পাঠায়? কতবার বলিছি, রাত্তিরে চুল খোলা রাখবি না, তা ঢঙি বউ সেকথাই শোনেনা! স্বামীর অকল্যাণের কথা যে না ভাবে... ছোটলোকের ঘরের মেয়ে... বিয়ের সময় একখানা শাড়ি দিয়েছে, শাড়ি তো নয় গামছা–

বলতে বলতে উঠে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডলি বাসনার চুল ধরে টেনে ফেলে দিল মাটিতে। আজ বিকেল পর্যন্ত ছেলের বউ ছিল তার আদরের পুতুল। মাতৃস্নেহ তাকে হঠাৎ উন্মাদিনী করেছে।

অন্য স্ত্রীলোকেরা ডলিকে জোর করে ছাড়িয়ে দিল।

ডলি তখনও চিৎকার করছে, বনবিবির পুজো দেবে? কেন, জয়মণিপুরে বনবিবির থান নেই? খালিসপুরে নেই? উজিয়ে সেই বাঘের মুখে যেতে হবে? শতেকখোয়ারি মাগি, ছোটলোকের ঘরের মেয়ে...কোনও রকম হায়া জ্ঞান নেই...।

ডলিকে দুজনে টানতে টানতে নিয়ে গেল অন্য দিকে।

পুরুষের দল কথা থামিয়ে এ-দিকে চুপ করে চেয়ে ছিল। মেয়ে ছেলেদের ব্যাপারে তারা মাথা ঘামায় না।

তারপর গোড়া থেকে সব খুলে বলল তো?

আমি বলছি।

তুই থাম সাধুচরণ, মাধবের মুখ থেকে শুনব।

হাঁটু দুটো দুহাত দিয়ে ঘিরে বসে আছে মাধব। ডান হাতটা মুঠো করে পাকানো আঙুলের ফাঁকে চেপে ধরা একটা বিড়ি টানার কথা খেয়াল নেই। বিনা দোষে প্রচণ্ড শাস্তি পাওয়া মানুষের মতো তার মুখ। সে প্রায়ই ভাবছে নিজের কথা। মনোরঞ্জন মারা গেছে, কিন্তু সে নিজেই কি মরেনি? কাঠ বা মধু কিছুই আনা হল না, ফিরতে হল খালি হাতে, অথচ পরিমল মাস্টারের কো-অপ দোকানে ধার রয়ে গেল। এই ধার কী করে এখন শুধবে? মনোরঞ্জনের জন্য আপশোস করলে এখন তার নিজের পেটের জ্বালা মিটবে?

তাহলে শোনেন, প্রথম রাইতটা তো আমরা কাটাইলাম দত্ত ফরেস্টে, ফরেস্ট-অফিসের ধারেই। বড়বাবু ঘুমায়ে পড়েছিলেন, তেনারে তো জাগানো যায় না, পরদিন সকালে পারমিট দেখাতে হবে। সে-রাইতে রান্না করল সাধুচরণ আর বিদ্যুৎ, মনোরঞ্জন আমাগো দুই-তিনখান গান শোনাইল..আহা কী যেন একখান, ভারি সুন্দর গান গেয়েছিল..আমরা কইলাম, মনোরঞ্জন, আর একবার গা, আর একবার...।

পরদিন সকালে ভাটা, তাই বসে থাকতে হল দুপুর পর্যন্ত। তারপর ওরা যেতে লাগল মরিচঝাঁপির পাশ দিয়ে। হাল একজন, বৈঠা একজন, অন্য চার জন তাস পেটায়। সন্ধের কাছাকাছি একটা খাড়ির মুখে নৌকো বেঁধে কতক খেপলা জাল ফেলে দেখা হল মাছের আশায়। জোয়ারের সময় মাছ পাওয়ার আশা খুব কম, শুধু শুধু পণ্ডশ্রম হতে হতেও

শেষবারে সাধুচরণের হাতে উঠল একটা কচ্ছপ। বিদ্যুৎ ক্ষীণ আপত্তি তুলেছিল। কচ্ছপ অযাত্রা। সে-কথায় কেউ পাত্তা দেয়নি। নোনা জলের কচ্ছপের স্বাদই আলাদা।

নৌকোয় একটা মুরগি রয়েছে অবশ্য, কিন্তু সেটি ছোঁয়া যাবেনা। ওটা বনবিবির কাছে মনোরঞ্জনের মানত করা।

রাত্তিরে নৌকো চালানো হবে কিনা তা নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। ছ'জনের মধ্যে চার জনই এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে, কিন্তু দলনেতা হিসেবে মাধব বলেছিল, না। এরপর আর কোনও জনবসতি নেই, এখানে ডাকাতদের অবাধ স্বাধীনতা। প্রথম কয়েকটা রাত অন্তত হাল-গতিক বুঝে নেওয়া দরকার।

খুব ছোট একটা খাড়ির মধ্যে ঢুকে এমন ভাবে নৌকো বাঁধা হল, যাতে বাইরে থেকে দেখাই যাবে না। দুজন দু'জন পালা করে রাত জেগে পাহারা দেবে। কচ্ছপের মাংসটা জমে গেল দারুণ, ভাত কম পড়ে গেল মাধবের, যেটুকু ঝোল বাকি ছিল তাতেই সে আর এক থালা ভাত মেরে দিতে পারত।

গান গাওয়া নিষেধ বলেই ঘুমিয়ে পড়ল মনোরঞ্জন, সে আর নিরাপদ পাহারা দেবার পালা নিয়েছে শেষ রাত্রে। কিন্তু মাঝরাতেই জেগে উঠতে হল সবাইকে। বিদ্যুৎ জাগিয়ে দিল, খুব কাছ দিয়ে নৌকো যাচ্ছে দু'খানা। বিদ্যুতের ফিসফিসে গলা কেঁপে যাচ্ছে ভয়ে। সাধুচরণ আরমনোরঞ্জন পাটাতনের তলা থেকে বার করল দু'খানা লাঠি। কিন্তু ঘুমচোখেই মাধব নৌকো দু'খানা এক নজর দেখে নিয়ে বলল, কী আপদ! এর জইন্যে কাঁচা ঘুমড়া ভাঙাইয়া দিলি। ও কিছু না, অরা চোরাই কাঠের ব্যাপারী।

মাধব ভুক্তভোগী, সে ডাকাতেব নৌকো চেনে। একটা দল এ-দিকে ডাকাতি করে পালিয়ে যায় জবাংলায়, আবার জয়বাংলায় ডাকাতি করে চলে আসে এ-দিকে। ওদের হাতে পড়লে এই লাঠিতে কুলোবে না, ওদের কাছে বন্দুক থাকে।

নির্বিঘ্নে রাত কেটে গেল। আবার যাত্রা। মরিচঝাঁপি থেকে কিছু শুকনো ডালপালা তুলে নেওয়া হল, জ্বালানির জন্য। এ জঙ্গলে ভাল জাতের কাঠ বিশেষ কিছু বাকি নেই, বাঙাল-রিফিউজিরাই কেটে সাফ করে দিয়ে গেছে প্রায়।

এবার আসল দিনটার কথা। সেটা চতুর্থ দিন। তার আগে এক দিন মাঝনদীতে পেট্রোলের লঞ্চ অর্থাৎ পুলিশ পেট্রল ওদের নৌকো আটকায়। সেদিন বড় আনন্দ হয়েছিল মাধবের। পুলিশের নাকের ডগায় দেখিয়ে দিল পারমিটের কাগজখানা। এর আগে আর কোনও বার সে এমন গর্বোন্নত মুখে পুলিশের সামনে দাঁড়াতে পারেনি। পুলিশরাও চিনতে পেরেছে মাধবকে। তাকে বেকায়দায় না পেয়ে বড়ই নিরাশ হয়েছিল তারা।

এরপর কাহিনির মধ্যে খানিকটা কারচুপি আছে। মাধব মিথ্যে কথা তেমন ভাল করে সাজিয়ে বলতে পারে না বলে সে হঠাৎ কাশতে শুরু করে দিল। কাশির দমকে বেঁকে গিয়ে কোনওক্রমে বলল, এবার থেকে তুই বল, সাধু... আপনেরা অর মুখ থেইক্যা শোনেন।

সাধুচরণ বলল, মঙ্গলবার দিনকে সকাল ন'টায় পৌঁছে আমরা প্রথমে বনবিবির পুজো দিলাম। সে-বেলাটা আর কাজে হাত না দিয়ে দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর... প্রথমেই শুভ লক্ষণ...দেখি যে সামনের একটা গরাণ গাছের মাথায় বসে আছে একটা কাঁক, এই অ্যাত্ত বড়।

কাক নয়, কাঁক। খুবলম্বা গলাওয়ালা একজাতীয় পাখি, সাদায় কালোয় মেশানো, কাটলে অন্তত সোয়া কেজি মাংস হবে, বড় লোভনীয়, খুব সুস্বাদু। এ-দিকে কাঁক প্রায় দেখাই যায় না। সুতরাং কাঁকের নাম শুনে এই শোকের উঠোনেও শ্রোতাদের মন আনচান করে উঠল।

মারতে পারলি সেটাকে?

নাঃ! নিরাপদ গুলতি নিয়ে গেল, কিন্তু টিপ করার আগেই সে সুম্বন্ধির ভাই উড়ে পালাল।

সুন্দরবনের সব জঙ্গলই বাইরে থেকে দেখতে এক রকম। নৌকোয় বা লঞ্চে চেপে পাশ দিয়ে গেলে তিন নম্বর ব্লক বা সাত নম্বর ব্লকে কোনও তফাত নেই। তবে পারমিটের এলাকা মানেই বারোয়ারি। আর পাঁচ জন আগে থেকেই এসে সেখানকার ভাল ভাল মাল তুলে নিয়ে গেছে। ওদের পারমিট ছিল ওই তিন নম্বর ব্লকে গাছ কাটার।

কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে আসল জঙ্গল হল সাত নম্বর ব্লক। শুধু কাঁক কেন, শামুকখোল, কাস্তেচরা, বাটাম পাখির ছড়াছড়ি সেখানে। ঝাঁকের পর ঝাঁক, গুলতি চালালে একটা-দুটো মরবেই। আর ভাল ভাল জাতের কাঠও আছে এই সাত নম্বরেই। মোটা মোটা হেঁতাল আর গরাণ- এই দুই জাতের কাঠের ভাল দাম পাওয়া যায়। সুন্দরী গাছ এ তল্লাটে নেই বললেই চলে, সবই পড়েছে বাংলাদেশের সুন্দরবনে, এ-দিকে যা কিছু আছে তা ওই সাত নম্বর ব্লকেই।

পৃথিবীর অন্যান্য সব নিষিদ্ধ দ্রব্যের মতোই নিষিদ্ধ জঙ্গলের প্রতিই মানুষের বেশি আকর্ষণ। আর, তিন নম্বর ব্লক থেকে সাত নম্বর ব্লক কতটুকুই বা দূর, আড়াআড়ি দুটো নদী পার হয়ে তিনটে ব্ল্যাক ছাড়ালেই হয়। এদিকে পেট্রোলের লঞ্চ বা নৌকোও তেমন আসে না। তিন নম্বর ব্লকে বনবিবির পুজো দিয়ে ওরা রওনা হয়েছিল সাত নম্বর ব্লকের দিকে। সুতরাং ওদের অভিযান সাত নম্বর ব্লকে হলেও সাধুচরণ সুকৌশলে বর্ণনা দিতে লাগল তিন নম্বরের নিরীহ জঙ্গলের।

তিন নম্বরে বাঘ নেই। সাত নম্বরে যদি বাঘ না থাকবে, তাহলে সেটা নিষিদ্ধ জঙ্গল হবে কেন? সাত নম্বর একেবারে কোর-এরিয়ার মধ্যিখানে। তবু পাঁচ-পাঁচটা জোয়ান ছেলে যদি সেখানে যেতে চায়, মাধব আপত্তি করতে পারে কি? মাধব পুলিশের ভয় পায়, ফরেস্ট অফিসের বাবুদের ভয় পায়, এমনকী ডাকাতদেরও ভয় পায়। কিন্তু কোনও জঙ্গলকেই সে ভয় পায় না। সে একলা যমেরও মুখোমুখি হতে পারে, যদি যম প্রকৃত বীরপুরুষের মতো খালি হাতে একা লড়তে আসেন তার সঙ্গে। যদি তিনি বড়মিঞার ছদ্মবেশে আসেন, তাতেও মাধবের কুছ পরোয়া নেই।

মাধব বার বার ওদের বাজিয়ে নিয়েছিল। সাধুচরণ, বিদ্যুৎ, নিরাপদ, সুভাষ আর মনোরঞ্জন একবাক্যে রাজি। একে তো পাখির মাংস খাওয়ার লোভ, তাছাড়া, এত কষ্ট করে এসেছে যখন, তখন নৌকো ভর্তি ভাল ভাল কাঠ নিয়ে না ফিরতে পারলে আর লাভ কী? এই লাভের চিন্তাটাই মাধবকে বেশি টানে।

নিয়ম হল, নৌকো বাঁধবার পর বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে জলটা বুঝে নিতে হয়। সাত নম্বর ব্লকে অনেক বাঁদর আছে, এই বাঁদরের ডাকের ধবন শুনে টের পাওয়া যায় বাঘের গতিবিধির। সব লক্ষণই বেশ ভাল।

আশ্চর্য ব্যাপার। বাঘের নামে যেমন গা ছম ছম করে, তেমনি আকর্ষণও করে। দেরি সহ্য হয় না, মনে হয়, কখন জঙ্গলে নামবে। সাধুচরণ আর নিরাপদ অস্থির হয়ে বলেছিল, জঙ্গল তো একেবারে পরিষ্কার। তা বলে এবার...। মাধব তাদের ধমকে বলেছিল, দাঁড়া। এত হুড়াহুড়ি কীসের?

নদী এখানে খুব চওড়া। এ-পারে ও-পারে বনের সবুজ রেখা। আকাশ যেন এখানে বিশাল ডানা মেলে আছে। পাড়ের থকথকে কাদার মধ্যেও উঁচু উঁচু হয়ে আছে বড় বড় শূল। তারপর ছোট ছোট হেঁতালের ঝোঁপ। জোয়ারের সময় ওই গাছগুলোর অর্ধেকপর্যন্ত জলে ডুবে যায়। আর এই হেঁতালের হলুদ-সবুজ ঝোপের আড়ালেই বাঘের লুকিয়ে থাকার সব চেয়ে ভাল জায়গা।

সন্ধের সময় পৌঁছে ওরা পাড় থেকে অনেক দূরে নৌকো বেঁধে রইল। বাঘ সাঁতরেও আসতে পারে বটে, কিন্তু ওরা তো দু'জন দু' জন পালা করে জেগে থাকবেই। আসুক না একবার সাঁতরে, জলের বাঘকে পিটিয়ে মারা বড় আরামের। ওদের প্রত্যেকেই মনে একবার অন্তত একটা বাঘ মারার ব্যাপারে অংশ নেওয়ার সুখস্বপ্ন লুকিয়ে আছে। বাদা অঞ্চলে এমন মানুষ একটিও নেই যে পাশ ফিরে পড়ে থাকা নিহত বাঘের মুখ দেখে জীবনে অন্তত একবার আমোদ করতে চায় না। এরা জানে না, ডেনমার্কের যুবরাজের মনের খবর।

সারা রাত জঙ্গল একেবারে নিস্তব্ধ। এমনকী বাঁদরদের হুপোহুপিও নেই। শুধু সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল জলতরঙ্গ পাখির ডাক। ট-র-র-র। ট-র-র-র। ট-র-র-র! কেউ কোনও দিন এই জলতরঙ্গ পাখি চোখে দেখেনি। শুধু রাত্তিরবেলা এদের ডাক শোনা যায়।

ভোরবেলা কিছু দূরে মানুষের গলার আওয়াজ শুনে ওরা একেবারে তাজ্জব। মাধব তক্ষুনি চার হাতে বৈঠা চালিয়ে পালাতে চেয়েছিল, কিন্তু সামনের বাঁক ঘুরে একটি নৌকো এ-দিকে আসতেই ওরা আশ্বস্ত হল। পুলিশ বা বনরক্ষী নয়, ডাকাতও নয়, অন্য নৌকোটির হাল ধরে আছে কুমিরমারির দাউদ শেখ, ওদের সবারই চেনা। বেশ বড় একটা পার্টি নিয়ে এসেছে দাউদ শেখ, এদেরও চোরাই কাঠের ধান্দা। দু'টি নৌকো পাশাপাশি এসে বিড়ি ও শুভেচ্ছা বিনিময় হল। ওদের দলে এক জন মউলে রয়েছে, সে মধুর সন্ধান দিতে পারবে।

তাহলে তো একেবারে নিশ্চিন্ত। এত মানুষজন দেখলে বড় মিঞার বাবাও এ-দিকে আর ঘেঁষবে না। মাধব তক্ষুনি ঠিক করে নিল, খুব চটপট কাজ সারতে হবে, এখানে দু'দিনের বেশি থাকা নয়, সারাদিন খেটে এখান থেকে সংগ্রহ করতে হবে বারো আনা মতো কাঠ। বাকি চার আনার জন্য ফিরে যেতে হবে তিন নম্বর ব্লকে, সেখানে থেকে আবার কিছু কাঠ কেটে সেই কাঠ চাপা দিতে হবে ওপরে।

দাউদ শেখের নৌকো খুঁটি গাড়ল ওদের দৃষ্টিসীমার দূরত্বের মধ্যেই। তবে ওরা যাবে বাঁ-দিকে। আর এরা যাবে ডান দিকে, যাতে জঙ্গলের মধ্যে নেমে দু'দলে গুতাগুতি না হয়। শুধু মৌচাকের সন্ধান যে-দলই পাক, অন্য দলকে তার সন্ধান দিয়ে অর্ধেক ভাগ দিতে হবে, এই রইল মৌখিক চুক্তি।

যত সহজ ভাবা গিয়েছিল, তত সহজ নয় পাখি মারা। যে কাঁক পাখিটার কথা সাধুচরণ বলল তিন নম্বরে দেখেছে, আসলে তো সেটা ছিল সাত নম্বরে একটা গরাণ গাছের মাথায়। এই পাখিগুলোর অদ্ভুত স্বভাব, এরা গাছের মগডাল ছাড়া বসে না। নিরাপদ

গুলতি চালিয়ে সেটাকে তো মারতেই পারল না, বরং সেই তোড়জোড়ে উড়ে গেল কাছাকাছি চরের ওপরে বসে থাকে একঝাঁক কাস্তে চরা।

রাতের হিমেল হাওয়া লেগে সুভাষের গায়ে বেশ জ্বর এসে গেছে। এবং এক রাতের জ্বরেই মুখটা বেশ ফুলে গেছে তার, চোখ দুটো পাকা করমচার মতো। বেশ চিন্তার ব্যাপার। এই অবস্থায় তার পক্ষে গাছ কাটতে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আবার তাকে নৌকোয় একা রেখে যাওয়া যায়ই-বা কী করে? এক জন কেউ থেকে যাবে তার সঙ্গে? কে থাকবে, মনোরঞ্জন! বিদ্যুৎ! সবাই এ-ওর মুখের দিকে তাকায়। অর্থাৎ কারুরই থাকার ইচ্ছে নেই। জঙ্গলে পা দেওয়ার জন্য চাপা উত্তেজনা যেন আর দমন করতে পারছে না। সুভাষ বলল, না, নয় আমি একাই থাকব! দিনেরবেলা...হেঃ...তাতে আবার ভয়? সত্যিই দিনের আলোয় কোনও ভয় মনে আসে না। সুভাষকে রেখে যাওয়া হল নৌকোয়, রান্নাবান্নার ব্যবস্থা সে-ই করবে।

কুড়ুল আর করাত নিয়ে বাকিরা নেমে পড়ে নৌকো থেকে। লুঙ্গি পরা খালি গা, খালি পা। এদের মধ্যে একমাত্র মাধব ছাড়া বাকি চার জনই কিন্তু মাঝে-মাঝে শৌখিন জামা গায়ে দেয়, সাধুচরণ এবং মনোরঞ্জন ফুল প্যান্টও পরে। ক্যানিং-এ কখনও সিনেমা দেখতে গেলে ওরা বেশ সাজগোজ করেই যায়। মনোরঞ্জন শ্বশুর বাড়ি গিয়েছিল বিয়ের সময় কাবলি জুতো পায়ে দিয়ে।

হাঁটু পর্যন্ত থকথকে কাদার মধ্যে দিয়ে ওরা বেশ ফুর্তির সঙ্গেই এগিয়ে যায়। শূলগুলো বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে গেলেও ভাঙা শামুক-ঝিনুকে একটু আধটু পা কাটবেই। ওপরে উঠে আসার পর বোঝা যায় বনটি বেশ নিবিড়, এগোতে হবে ঝোপঝাড় ঠেলে। সামনের প্রথম সারির হেঁতালের ঝোপের ওপর কয়েক বার কুড়ুলের ঘা দিতেই ভন ভন করে ওড়ে ঝাঁক ঝাঁক মশা। একটা ছোট গো-সাপ সরসরিয়ে জলে নেমে পড়ে। এ সবই ভাল লক্ষণ।

জঙ্গলের মধ্যে এগোতে হয় লাইন করে। মাধবই সব চেয়ে ভাল চেনে জঙ্গল, সেই জন্য সে আগে আগে যায় পথ তৈরি করবে। কোথাও কোনও শব্দ নেই, তাদের পায়ের শব্দ

ছাড়া। ভাল গাছের জন্য যেতে হবে একটু ভেতরে, যত দূর পর্যন্ত জোয়ারের জল ওঠে সেই সীমারেখা ছাড়িয়ে।

দাউদ শেখের পার্টি এখনও পাড়ে নামেনি। এখান থেকে শোনা যাচ্ছে ওদের কথাবার্তা। ওদের তুলনায় মাধবের দলটির অবস্থা অনেক ভাল, যদি দৈবাৎ পেট্রলের নৌকো এসেও পড়ে, ওরা পারমিট দেখিয়ে বলবে, ভুল করে তিন নম্বরের বদলে সাত নম্বব ব্লকে এসেছে, নদী চিনতে পারেনি। তার জন্য বড় জোর দশ-বিশ টাকা প্রণামি দিতে হবে, নৌকো কেড়ে নেবেনা, জেলেও দেবে না। দাউদ শেখ এ-সব ব্যাপারে একেবারে বেপরোয়া।

একটা গাছেও কোপ মারেনি। মাধব আগাছা সাফ করতে করতে অনেকটা এগিয়ে গেছে। তারপর সাধুচরণ, তারপর বিদ্যুৎ, তারপর মনোরঞ্জন, সব শেষে নিরাপদ। নিরাপদর কোমরে গুলতিটা গোঁজা। তার দু'চোখ এদিকে ও-দিক ঘুরছে পাখির সন্ধানে। একটু বুঝি সে অন্য মনস্ক হয়ে পড়েছিল।

মাথায় খুব জোর কেউ ঘুষি মারলে চোখের সামনে যেমন খানিকটা হলুদ দেখা যায়, সেই রকমই একটা হলুদের ঝিলিক শুধু দেখতে পেল নিরাপদ, তারপর একটু দূরের একটা ঝোপে হুড়মুড় শব্দ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তুমুল শোরগোল শোনা গেল দাউদ শেখের নৌকো থেকে।

কী হয়েছে ঠিক বুঝতে না পেরেই নিরাপদ চেঁচিয়ে উঠল, ওরে বাবা রে! মা রে! সাধুচরণের বর্ণনায় এইখানে বাধা দিয়ে মাধব বলল, আমি যেই সেই চিখখৈর শুনিছি, অমনি আর চোক্ষের পলক না ফেইল্যা পিছন ফিরাই রোকেলের মতো (লোকাল ট্রেনের মতো) ছুটে আসিছি। দেখি যে নেরাপদডা ভেউ ভেউ কইরা কান্দে। আমি যত জিগাই কান্দোস ক্যান– ।

বিদ্যুৎ বলল, এই যে দেখুন নিরাপদটা এই রকম একটা বাঁশপাতার মতো থরথর করে কাঁপছিল।

নিরাপদ বলল, আমি কী করব। কিছুই ঠিক দেখিনি। কিছুই ঠিক বুঝিনি, তবু এমনি এমনিই আমার শরীরটা কাঁপতে লাগল, মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না, কিন্তু চোখ দিয়ে জল পড়ে। এমন আমার জীবনে কখনও হয়নি।

সাধুচরণ বলল, আমরা তখনও ভাবছি দাউদ শেখদেরই কোনও বিপদ হয়েছে।

সুভাষ বলল, আমিও নৌকো থেকে শুনছি দাউদ শেখরাই চ্যাঁচাচ্ছে বেশি। ওরা শুধু বলছে বড় মামা! বড় মামা! সেই শুনে তো আমারও কাঁপুনি ধরে গেছে।

মাধব বলল, আমিই প্রথম কইলাম, মনা কই? মনোরঞ্জন?

সবাই ঠিকঠাক আছে, শুধু মনোরঞ্জন নেই। সে সকলের সামনে ছিল না, একেবারে পিছনেও ছিল না, তবু বাঘ তাকেই বেছে নিল।

বর্ণনা শুনতে শুনতে মহাদেব মিস্তিরি বলে উঠল, অ্যাঁ? বলিস কী? শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু!

বিস্মিত হবারই কথা। কাহিনিটি যে এত সংক্ষিপ্ত হবে, তা কেউই কল্পনা করতে পারেনি। বাঘের গর্জন নেই, ঝটাপটি, লড়ালড়ি কিছু হল না, এরমধ্যে সব শেষ হয়ে গেল? ওদের অভিযান শুরু হতে না-হতেই সারা?

এই সময় আবার ডুকরে কেঁদে উঠল মেয়েমহলে। কামোট-কুমির, জোঁক-সাপ-বাঘ, ভূত-পেত্নি কলেরা নিয়ে ঘর করতে হয় বাদার মানুষদের, অপঘাতে মৃত্যুর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু যার বিয়ের পর এক বছরও পেরোনি, সেই মনোরঞ্জনকেই টেনে নিল নিয়তি?

মহাদেব মিস্তিরি ঠোনা মেরে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কিস্যু করতে পারলে না?

মাধব উত্তর না দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

সাধুচরণ আবার শুরু করল তার বিবরণ।

সম্বিত ফিরতেই সকলে হাঁপর ঝাঁপড় করে দৌড়ে এল নৌকোয়। কিন্তু এ-কথা সবাই এক বাক্যে সাক্ষী দেবে যে শুধু একলা মাধব ফেরেনি। আরলুশ কাঠের মতো শক্ত হাতে কুড়ুলটা উঁচু করে তুলে সে পাগলের মতো চিৎকার করছিল, কোথায় গেলি শশালা, আয়াওরে পুঙ্গীর ভাই, ওরে চুতমারানির ব্যাটা, আয়। ওরে হারামজাদা, ওরে শুয়ারকি বাচ্চা, শোগামারানি..।

দক্ষযজ্ঞের মহাদেবের মতন সে তাণ্ডব নাচতে থাকল বনেব মধ্যে। আর গালাগালির ঝড় তার মুখে। সবাই মাধবের নাম ধরে ডাকছে। সে শুনতেই পাচ্ছে না। তারপর খানিক বাদে দাউদ শেখের দল আর সাধুচরণরা এক সঙ্গে মিলে গেল মাধবের কাছে। মাধবের তখন চোখ দুটি লাল, টকটকে, মুখের পাশ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে। সকলে গা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিল প্রবল ভাবে। এ-রকম শুনলে বাঘ শিকার ফেলে পালায়।

কিন্তু অত চেঁচামেচি কিংবা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মনোরঞ্জনের লাশ পাওয়া যায়নি।

সাধুচরণ বা মাধবরা তো কেউ বাঘটাকে চোখেও দেখেনি, নিরাপদ পাখি-খোঁজায় একটু অন্য মনস্ক ছিল, সে শুধু দেখেছে একটা হলুদ ঝলক। দাউদ শেখ দাবি করে যে সে বাঘের পেছন দিকটা একবার দেখেছে ঝোপের মধ্যে। ওই রকম সা-জোয়ান চেহারা মনোরঞ্জনের, তাকে মুখে নিয়ে বাঘটা একেবারে চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল?

কিন্তু তুমি তো গুণিন, মাধব? তুমি থাকতে সেখানে বাঘ এল। তুমি আগে মন্তর পড়ে জঙ্গল আটক করোনি?

একথা ঠিক, মাধব এক জন গুণিনও বটে। সে সাপের বিষ ঝাড়ার মন্ত্রও জানে। সেই জন্যই তো সে জঙ্গলকে ভয় পায় না।

মাধব পিছনের অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরিয়ে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে বলল, হ, আটক করেছিলাম। আমার মন্তর খাটে নাই।

খাটেনি তা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু কেন এমন হল?

এবার মাধব একটা অদ্ভুত যুক্তি উপস্থিত করল।

সে চিক করে বাঁ-পাশে থুতু ফেলে বলল, কী জানি! বোধ হয় সেই দিন আমার জন্মদিন আছিল

জন্মদিন?

হ। আপনে জানেন না, জন্মদিনে কোনও গুণিনেরই মন্তব খাটে না?

তা তোমার যে সে-দিন জন্মদিন, তুমি আগে জানতে না?

ক্যামনে জানব? মায় মরেছে সেই কোন ছুটকালে, আর আমার বাপে আমারে দুই চক্ষে দ্যাখতে পারত না। আমারে খ্যাদাইয়া দিছিল। আমারে আমার জন্মদিনের কথা কে কইয়া দেবে? জন্মদিন তো দূরে থাক, নিজের জন্মবারটাই জানি না। আমি আদাড়-ছাদাড়ের মানুষ, কোনও রকমে খুদ কুড়ো খেইয়ে এতগুলান দিন বেঁচে আছি আর কত দিন টানতে পারব কে জানে…।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেকে গেল মাধব। তারপর মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে রইল অন্ধকারের দিকে।

.

বাসনার বাসা বদল

পরিমল মাস্টারের ঘুম ভাঙল ধুম জ্বর নিয়ে। এই জন্যই সারা রাত ভাল করে ঘুম আসেনি, এ পাশ ওপাশ ছটফট করেছে। বড় বিচ্ছিরি এই দখনে জ্বর, যখন তখন আছে, একবার ধরলে সহজে ছাড়তে চায় না।

চোখ মেলার পর একটা হাত দিয়ে কপালটা অনুভব করেই তার ঠোঁট তেতো হয়ে গেল। তার পরই তাঁর মনে পড়ল, আজ অরুণাংশু আসবে। যদি ভোরের ট্রেনেই রওনা দেয় তা হলে এখানে পৌঁছতে পৌঁছতে আড়াইটে-তিনটে হবে। কতটা দূরত্ব হবে কলকাতা থেকে? মাইলের হিসেবে ষাট-সত্তর মাইল, বড় জোর আশি, পাখি-ওড়া মাপে এই দূরত্ব পেরুতেই পাক্কা দশ ঘণ্টা লাশে, তা-ও যদি ঠিকঠাক লঞ্চ ধরা যায় ক্যানিং থেকে। একটা লঞ্চ না পেলেই সারা দিন কাবার।

সুলেখা তখনও জাগেনি। ভোরবেলা উঠে বাগানে পায়চারি করা পরিমল মাস্টারের স্বভাব। মানুষের শরীরে বিদ্যুৎ থাকে, শিশিরভেজা মাটির ওপর খালি পায়ে হাঁটলে তা চলে যায়, মন প্রসন্ন হয়। আজ সকালে বাগানে যাওয়া হবে না। বাগান মানে কাঁচা লঙ্কা ও বেগুনের খেত, অন্য সময় হয় উচ্ছে বা শশা বা ঢ্যাঁড়শ, সামনের দিকে কয়েকটা জবাফুলের গাছও আছে অবশ্য।

আজ অরুণাংশু না এলেই ভাল হত। শহরের সংস্পর্শ পেতে আজ পরিমলের একটুও ইচ্ছে করছেনা। আবার চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করল। ঘুম নয় একটু আরল্পী আসে, তাতে চলচ্চিত্রের মতো ছোট ছোট স্বপ্ন।

তোমার চা।

এরই মধ্যে কখন স্নান সারা হয়ে গেছে সুলেখার। তাঁর ভিজে চুলের প্রান্ত থেকে জল ঝরছে। স্নানের ঠিক পর সব মেয়েকেই কেমন যেন পুণ্যবতী পুণ্যবতী দেখায়। সুলেখার দিকে তাকিয়ে শীত করে উঠল পরিমলের।

চায়ের কাপে প্রথম চুমুকটা দিয়ে সিগারেটের টানটা ফিরে এল। সুলেখার সামনে উচ্চারণও করা যাবেনা। অরুণাংশু এলে অবশ্য প্রচুর সিগারেট খেতে হবে। অরুণাংশু নিজে যতগুলো খায়, অন্যদেরও খেতেই হবে ততগুলো। নিজের প্যাকেটই হোক আর অন্যের প্যাকেটই হোক, হাতের সামনের প্যাকেট খুলে সে মুড়ি মুড়কির মতো সিগারেট ছড়ায়।

সুলেখার নিষেধের জন্যই নয়, পরিমল নিজেই চায় সিগারেট ছাড়তে। স্বাস্থ্যের ব্যাপার তো আছেই, তা ছাড়া অযথা বাজে খরচ, এবং কেন এই নেশার দাসত্ব? কিন্তু সিগারেট যেন ঠিক মশার মতো। বন্দুক দিয়ে বাঘ-ভালুক মারা যায়। কিন্তু মশা যেমন শেষ করা যায় না, তেমনি ছাড়া যায় না এইসব চেয়ে ছোট নেশাটা।

পরিমল অপেক্ষা করছে কখন সুলেখা নিজে থেকে বুঝতে পারবে। তার আগে সে বলবে না তার জ্বর হয়েছে।

একসময় খবরের কাগজ ছাড়া সকালের চা খাওয়া কল্পনাই করা যেত না। এখানে কাগজ আসে দুপুর তিনটের লঞ্চে। না পড়লেও হয় সে-কাগজ।

হাতঘড়ির পাশের টেবিলের ট্রানজিস্টর রেডিয়োটা সে চালিয়ে দিল। রেডিয়োতে যে এত চাষবাস নিয়ে কথাবার্তা হয়, শহরে থাকতে কোনও দিন তা টের পাওয়াই যায়নি। অথবা এতটা বোধহয় আগে হত না। মন দিয়ে সে শুনতে লাগল চাষিভাইদের জন্য পাট চাষ বিষয়ে পরামর্শ। খুব একটা ভুল বলে না, অভিজ্ঞ লোকদেরই ডাকে রেডিয়ো। শুধু একটা জিনিস ওরা বোঝে না। যেখানে বৃষ্টি হয়নি, বিদ্যুৎ নেই বলে যেখানে পাম্প চলে না, নদীর নোনা জল সেখানে চাষের কাজে লাগাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, সেখানকার চাষিরা রেডিয়োতে অভিজ্ঞ লোকদের মুখে সময় মতো জলসেচের পরামর্শ শুনে কতটা উপকৃত হবে?

তুমি উঠবে না?

হ্যাঁ এই আর একটু। ক'টা বাজে?

সময় জানবার জন্য ঘড়ি দেখতে হয় না। রেডিয়োর অনুষ্ঠানগুলো প্রতি দিন এত ছক বাঁধা, বাংলা খবরের পর রবীন্দ্রসঙ্গীত, অর্থাৎ পৌনে আটটা। এতক্ষণ কোনও দিন শুয়ে থাকেনা পরিমল।

তোমার জ্বর হয়েছে?

গায়ে হাত না দিয়েও কী করে টের পেল সুলেখা? সত্যিই কি মেয়েদের সপ্তম ইন্দ্রিয় বলে কিছু ব্যাপার আছে? আসলে সুলেখারও একটু একটু জ্বর হয়েছে। প্রথম দু'এক দিন এ-রকম জ্বরকে উপেক্ষা করে সুলেখা, সেই জন্যই জোর করে স্নান করেছে। পরিমলের অসুখ-ভীতি বেশি, তাই স্বামীর স্পর্শ এড়িয়ে চলছে সুলেখা।

কী জানি, গাটা কেমন যেন ম্যাজ ম্যাজ করছে।

গ্রামসেবকদের মিটিং ক'টায়? এগারোটায় না?

যদি শরীরটা এ-রকম থাকে তাহলে ওদের একটা খবর পাঠাতে হবে, মিটিংটা বন্ধ রাখার দরকার নেই, ওরা নিজেরাই আলোচনা করুক।

বাইরের বারান্দায় দু'জন লোক বসে আছে। ওরা কোনও খবর দেয় না, নিজেদের উপস্থিতির কথাও জানায় না, বিড়ি ধরিয়ে উবু হয়ে বসে থাকে চুপচাপ। মাস্টারমশাই কিংবা দিদিমণি যখন বাইরে বেরুবে, তখন তো কথা হবেই।

ইলা নামে একটি তেরো-চোদ্দো বছরের মেয়ে এ বাড়িতে কাজ করে। সে দাসী নয়, সে স্কুলে যায়, রাত্তিরবেলা হ্যারিকেন জ্বেলে সে পড়তেও বসে। মহিলা সমিতিতে সেলাইয়ের কাজও শেখে, আবার রান্না-বান্নায় সুলেখাকে সাহায্য করে। ইলার বাবা ছিল বিখ্যাত ডাকাত বীরু গোলদার।

সেই বীরু গোলদারের নামে কত রোমহর্ষক কাহিনি প্রচলিত আছে এখনও। পুলিশের গুলি খেয়ে রায়মঙ্গল নদীতে লাফিয়ে পড়েছিল বীরু গোলদার, তারপর আর তাকে দেখতে পাওয়া যায়নি। অনেকের ধারণা সে আজও বেঁচে আছে, ঘাপটি মেরে আছে কোথাও। পাঁচ বছর বয়সের অনাথা মেয়ে ইলাকে আশ্রয় দিয়েছিল সুলেখা। এখন সে বাড়ির মেয়ের মতো।

বাইরের লোকদুটিকে দেখতে পেয়েছে ইলা। সকাল ন'টার মধ্যে যারা এ বাড়িতে আসে, তারা চা পাবার অধিকারী। বিশেষ দরকার না থাকলে কেউ মাস্টারমশাইয়ের বারান্দায় এমন ভাবে এসে বসবেও না। এটা তো আড্ডাখানা নয়।

দুটি গেলাসে করে চা এনে ইলা ওদের সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়। ওরা তবু মুখ খোলে না। এমনকী নিজেদের মধ্যেও কোনও কথা বলে না, কারণ বলবার মতো কিছুই নেই। একেবারে চুপ। শুধু সুলুপ সুলুপ শব্দে চায়ে চুমুক দেয়।

প্রায় এক ঘণ্টা বাদে সুলেখা একবার বাইরে এলে ওদের মধ্যে এক জন বলল, দিদিমণি আমরা একবার নাজনেখালিতে যাস্যি, মাস্টারমশাই কি যাবেন?

কেন সেখানে কী আছে? নাজনেখালিতে পরশুদিন পাড়া-মিটিং হয়ে গেছেনা?

তা তো হয়ে গিয়েছে। আমরা যাব একবার বিষ্টুপদ খাঁড়ার বাড়িতে। তার ছেলে, সেই যে একবার ভাস্কর পণ্ডিতের পার্ট করেছিল, আমাদের হাটখোলায় যাত্রা হল, আপনিও দেইখে ছিলেন।

হ্যাঁ কী হয়েছে তার?

তাকে বাঘে নিয়ে গিয়েছে নাকি।

এমন আলতো ভাবেওরা সংবাদটি দেয়, যেন কারুর বাড়ির গাভিন গোরুর বাচ্চা হওয়া কিংবা সরষে খেতে শুঁয়োপোকা লাগার মতো নৈমিত্তিক ব্যাপার!

সুলেখার প্রথমেই মনে পড়ে গত রাত্রির সেই নদী-পেরুনো কান্নার আওয়াজের কথা। নাজনেখালির দিক থেকেই আসছিল বটে।

সুলেখাকে চুপ করে থাকতে দেখে দ্বিতীয় জন খবরটিকে আরও একটু বিশ্বাসযোগ্য করে বলল, জঙ্গল মহলে গেসলো, মাধব মাঝির পার্টির সঙ্গে। এই তো সিদিনকে বিয়ে হল মনোরঞ্জনের।

তোমরা কার কাছে খবর পেলে?

প্রথম খেয়ার মাঝি এসে খবর দিল।

এ-ভাবেই খবর ছড়ায়। এতক্ষণে গোসাবা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে নিশ্চয়ই।

লোক দু'টিকে সুলেখা ডেকে আনল শোয়ার ঘরে। পরিমল মাস্টার কাহিনিটা শুনতে শুনতেই খাট থেকে নেমে এল, দেয়ালের তাক থেকে ব্রাশ নিয়ে তাতে পেস্ট মাখাল। ভেতরের উঠোনের টিউবওয়েল থেকে দ্রুত দাঁত মেজে এসে তিনি বলল, ইলা, আমাকে একটা জামা দে তো মা।

নিজের ঈষদুষ্ণ ডান হাতটি এবার স্বামীর কপালে ছুঁইয়ে সুলেখা বলল, তোমার তো অনেক জ্বর দেখছি।

ও কিছু হবে না, ঘুরে আসি একবার।

সুলেখা লোক দু'টিকে জিজ্ঞেস করল, এখন ভাটার সময় না?

কোনও রূপক নয়। একেবারে আক্ষরিক অর্থে নদীর জোয়ার-ভাটা অনুসারে এখানকার জীবন চলে। প্রতি দিন জলের দিক পরিবর্তনের সময় তাই এদের সকলের মুখস্থ।

হ্যাঁ, ভাটা পইড়ে গিয়েছে।

সুলেখা স্বামীকে বলল, তোমাকে যেতে হবে না, আমি যাচ্ছি ওদের সঙ্গে।

না না, আমার সেরকম কিছু হয়নি। আমি একবার চট করে ঘুরে আসব।

সরাসরি নৌকোয় গেলে এই ভাটার সময় শুধু যাওয়া আসাতেই সময় লাগবে অন্তত ছ'ঘণ্টা। কারণ নদীপথ অনেক ঘুরে। আর এখান থেকে কোনাকুনি কালী নদী পর্যন্ত হেঁটে গেলে, তারপর খেয়া পেরিয়ে আবার ও-পারে হাঁটা, তাতেও লাগবে প্রায় চার ঘণ্টা। যাওয়া মাত্র ফিরে আসা যায় না। অর্থাৎ এবেলা ওবেলার ধাক্কা।

জোয়ারের সময় নদীর জল কানায় কানায় ভরা থাকে বলে জেটি থেকেই নৌবেয়ে ওঠা যায়। আর ভাটার সময় অন্তত এক হাঁটু কাদা ভাঙতেই হবে দুটো খেয়াঘাটেই। সেই জন্যই এত জ্বর গায়ে স্বামীকে পাঠাতে দিতে রাজি নয় সুলেখা।

গত আট-দশ বছরের মধ্যে আশপাশের গ্রামের যে-কোনও পরিবারের বিপদে আপদে পরিমল মাস্টার গিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে। নাজনেখালির লোকেরা ধরেই নিয়েছে যে যে-কোনও সময় পরিমলমাস্টার এসে পড়বেন। সাধুচরণ তাই সকালেই গা-ঢাকা দিয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খানিকক্ষণ যুক্তি বিনিময় হল। ইলা সুলেখার পক্ষে। সে পরিমল মাস্টারকে যেতে দিতে চায় না, তাই জামা বার করে দেয়নি। শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতে হল পরিমলকেই। আজ স্কুলে ছুটি, আজকের দিনটা বিশ্রাম নিলে পরিমল হয়তো কাল সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। নয়তো আজ অসুস্থ অবস্থায় এত হাঁটাহাঁটি করলে কাল আরও শরীর খারাপ হবেই।

পরিমল থেকে যেতে রাজি হলে আরও এ জন্য যে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, বিকেলের দিকে অরুণাংশু আসতে পারে। তার অনুপস্থিতিতে অরুণাংশু এখানে এসে যদি কোনও গণ্ডগোল বাধায়? এই সব দিনে এই গ্রামের মধ্যে শহরের উপস্থিতি একেবারেই মানায় না।

সুলেখা ইলাকে বলল, আলু সেদ্ধ দিয়ে ফেনা-ভাত চাপিয়ে দিত নিজে বাড়ির অন্যান্য কাজ গুছিয়ে ফেলতে লাগল দ্রুত। এক ফাঁকে মহিলা সমিতি থেকেও ঘুরে এল। পাঁচটি মেয়ে সেখানে সেলাই কলে বসে লুঙ্গি বানাচ্ছে।

খানিকটা আপত্তি জানিয়ে তারপর সেই লোক দুটিও ফেনা-ভাত আলুসেদ্ধ খেয়ে নিল সুলেখার সঙ্গে। ওরা বেরুবার সময় পরিমল মাস্টার এক জনকে বলল, সাধুচরণকে পরে আনিস আমার কাছে। ওর সঙ্গে আমার দরকার আছে।

ওরা চলে যাবার অন্তত আধ ঘণ্টা পরে একটা বই পড়তে পড়তে হঠাৎ মুখ তুলে পরিমল মাস্টার ভাবল, ইস, একটা খুব জরুরি কথা তো ওদের বলে দেওয়া হয়নি। আচ্ছা, থাক, এখন আর অন্য লোক পাঠাবার দরকার নেই, দু-এক দিন পর নিজে গিয়েই বলবে।

এক ঘণ্টা হেঁটে সুলেখা পৌঁছল কালী নদীর খেয়াঘাটে। সেখানে একেবারে ভিড়ে ছয়লাপ। খেয়ায় পারানি মাত্র পাঁচ পয়সা, তা-ও ধার রাখা যায়। নিয়মিত খেয়ার নৌকোটি ছাড়া একটি স্পেশ্যালও চালু হয়েছে। কারুর তো কোনও কাজ নেই, তাই এ-দিকের গ্রাম উজাড় করে সবাই চলেছে নাজনেখালিতে। সেখানে বাঘ নেই। সেখানে বাঘে-ধরা মানুষটার লাশও নেই, তবু তো বাতাসে ভাসছে রোমাঞ্চকর গল্পটি।

ছেলে-ছোকরারা হুড়োহুড়ি লাগিয়েছে আগে খেয়া পার হবার জন্য। সুলেখা ভিড় ঠেলে একেবারে সামনে চলে এল। তাঁকে সবাই চেনে, সবাই একটু ভয়-ভয় করে। বুড়ো মাঝির বদলে তার দুই ছেলে, এক জনের বয়েস তেরো-চোদ্দ, অন্য জনের বয়েস দশের বেশি না। এরা চালাচ্ছে নৌকো। বড় ছেলেটির দিকে চেয়ে সুলেখা বলল, এই, তোর-খেয়ায় কজন লোক যাওয়ার নিয়ম রে?

সে-রকম ধরাবাঁধা নিয়ম কিছু নেই। বারো-চোদ্দো জন লোক উঠলেই নৌকো মোটামুটি ভর্তি হয়ে যায়। সেটা জেনে নিয়ে সুলেখা বলল, খবরদার, বারো জনের বেশি লোক একবারে নিবি না। এই করেই নৌকো ডোবে।

ভিড়ের মধ্যে কয়েকটি যুবকের দিকে তাকিয়ে সে বলল, তোমরা ভাই একটা কাজ করো না। তোমরা দাঁড়িয়ে থেকে একটা বন্দোবস্ত করো, যাতে এক নৌকোয় বারো জনের বেশি না ওঠে। গত মাসেই একবার খেয়ার নৌকো ডুবেছিল ।

সঙ্গের এক জন লোকের কাঁধে হাত দিয়ে, শাড়ি উঁচু করে, প্রায় হাঁটু পর্যন্ত থকথকে কাদার মধ্য দিয়ে গিয়ে সুলেখা নৌকোয় উঠল। পা ধুল না। ও-পারে গিয়ে তো আবার কাদায় নামতেই হবে।

মাথার কয়েকটা সাদা চুল ঝিলিক মারতে শুরু করলেও সুলেখার বয়েস যে ছেচল্লিশ হয়ে গেছে, তা বোঝা যায় না। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। পরনে হলুদ-কালো মেলানো তাঁতের শাড়ি। কারুকে বকুনি দেবার সময়েও সুলেখার মুখখানি হাসি হাসি করে রাখে।

একটা লঞ্চ যাচ্ছে, বড় বড় ঢেউয়ে দুলে উঠছে খেয়ার নৌকো। লঞ্চটার নাম পড়ে সুলেখা জিজ্ঞেস করল, মহারানি এ-দিক দিয়ে যাচ্ছে কেন?

যাত্রীদেরই এক জন উত্তর দিল, মহারানি তো এক মাস ধরে ভাড়া খাটছে টুরিস্ট ডিপার্টে।

কোনও কোনও রুটের সার্ভিস লঞ্চ মাঝে মাঝে সরকারের হয়ে মাসিক ভাড়া খাটে। আশ্চর্য কিছু নয়। সাধারণ যাত্রী কমে গেলে বাঁধা নির্দিষ্ট আয়ের গ্যারান্টি পাওয়া যায়।

ছুটির দিন, একদল শহরের ভ্রমণকারী লঞ্চে চেপে এসেছে সুন্দরবন দেখতে। এই দিকে কিছু দূর গেলেই সজনেখালি পাখিরালায়। যদিও মানসের হাঁসেরা শীতের শেষে অধিকাংশই উড়ে চলে গেছে। সজনেখালির টাওয়ারের ওপর উঠে এই সব নারী-পুরুষ উৎসুক ভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবে যদি বনের বাঘকে এক পলক দেখা যায়। দেখতে পেলে কত আনন্দ, কত বড় অভিজ্ঞতা। সুলেখা এ-কথা না ভেবে পারল না যে, ঠিক এই সময়ই সে চলেছে একটি বাঘে-খাওয়া মানুষের বাড়িতে। সে এর মধ্যেই শুনে নিয়েছে যে, সেই ছেলেটি মাত্র কিছুদিন আগেই একটি কচি মেয়েকে বিয়ে করে এনেছে। বাদা অঞ্চলে বিধবা হওয়া যে কী ব্যাপার, তা সুলেখা এর মধ্যে অনেক দেখেছে।

যদি বছর খানেকের মধ্যেই শোনা না যায় যে, ওই বাসনা নামের বিধবা মেয়েটি গর্ভবতী হয়েছে, তাহলে সেটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হবে। অবশ্য মেয়েটি যদি বাঁজা না হয়।

সুলেখা দেখতে এল শোকের বাড়ি, এসে দেখল সেখানে বিপুল ঝগড়া চলছে।

ডলির একেবারেই মাথা খারাপ হয়ে গেছে মনে হয়। পুত্র-শোক এখন দু'টুকরো হয়ে রূপ নিয়েছে হিংসে আর রাগের। বাসনাকে আর সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। তাকেই এই সর্বনাশের মূল মনে করে সে বাসনাকে এই দণ্ডেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়। বার বার সে বাসনাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে বাড়ির বার করে দিচ্ছে, আবার অন্যরা ফিরিয়ে আনছে তাকে। কুৎসিত গালাগালির ঝড় বইয়ে দিচ্ছে ডলি। বাসনার শ্বশুর থাকতে না পেরে পুত্রবধুর পক্ষ নিয়ে দু'একটা কথা বলতে গিয়েছিল ডলিকে। আর যায় কোথায়, আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। স্বামীকেও যা নয় গালাগালি শুরু করে দিল, এমনকী ডলি এমন ইঙ্গিতও করল যে, ছেলে মারা যাওয়ায় বাপ খুশি হয়েছে, তা তো খুশি হবেই, এমন ঢলানি বেওয়া মাগির জন্য...।

বাড়ির চারপাশে গিসগিস করছে ভিড়, অনেকে গাছে উঠে দেখছে। বাঘের গল্প এখন দূরে থাক, দুই স্ত্রীলোকের মারামারির মতো এমন মনোহরণ দৃশ্য আর হয় নাকি? টানাটানির সময় ওদের কাপড়চোপড় তো বেসামাল হচ্ছেই, তাছাড়া স্ত্রীলোকের মুখে যৌন-কথা পুরুষেরা বেশি উপভোগ করে।

বাসনাও একেবারে চুপটি করে নেই। কাল শেষরাত থেকে বেশ কয়েকবার মারধোর খাবার পর সে-ও মুখ খুলেছে। কবিতা বেচারি মা ও বউদির মধ্যে পড়ে থামাবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে, কিন্তু কে শোনে কার কথা। অন্য প্রতিবেশিনীরাও একেবারে হয়রান হয়ে গেছে। কর্তাব্যক্তিরা সব চুপ। মেয়েদের ঝগড়া তারা কী করে থামাবে?

এর মধ্যে এসে দাঁড়াল সুলেখা।

যে-সব গালিগালাজ বার্ষিত হচ্ছে, তা শুনলে সুলেখার মতো অন্য যে-কোনও ইউনিভার্সিটিতে পড়া নারীর কান লাল তো হবেই, সঙ্গে সঙ্গে কানে হাত চাপা দিয়ে দৌড়ে পালাতে ইচ্ছে হবে। সুলেখা কিন্তু একটুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বুঝে নিল। খুব যে আশ্চর্য হয়েছে, তা-ও নয়।

বিষ্টুপদ যেন খুব ভরসা পেল সুলেখাকে দেখে। কাছে এসে সারা শরীর মুচড়ে বলল, দ্যাখেন তো দিদিমণি, কী পেড়ার! মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছে। যত বলি, অন্তত শ্রাদ্ধ-শান্তিটা চুকুক, তারপর না হয় বউকে বাপের বাড়ি... কিছুই শোনে না। আপনি একটু বুঝ দিয়ে বলেন।

সুলেখা কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ডলি তাকেও একটা জঘন্য গালাগালি দিয়ে বসল।

তিন-চার জন স্ত্রীলোক জোর করে জাপটে ধরে আছে ডলিকে। সুলেখা তীব্র দৃষ্টিতে ডলির দিকে তাকিয়ে থেকে তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে ওকে বশ করার চেষ্টা করল। কিন্তু তাতে কোনও ফল হল না, গালাগালির স্রোত চলতেই লাগল। ডলি সত্যিই যেন খ্যাপা হয়ে গেছে।

এবার সুলেখা বিষ্টুপদর দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বলল, হাঁ করে দেখছেন কী? দরকার হলে ওকে বেঁধে রাখতে হবে, এই কি পাগলামী করবার সময়? এখন অনেক কাজ আছে না?

দিদিমণির কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে বিষ্টুপদ এবার চেপে ধরল তার বউয়ের চুলের মুঠি, তারপর মনের সাধ মিটিয়ে দু'খানা বিরাট চড় কষাল। তারপর সকলে মিলে ডলিকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের মধ্যে। বাইরে থেকে দরজায় শিকল তুলে দিল বিষ্টুপদ। এখন ও চেঁচাক যত খুশি।

দক্ষ সেনাপতির মতো সুলেখা এবার ভার নিল সব কিছুর। সাধুচরণকে পাওয়া না গেলেও মাধব, সুভাষ, বিদ্যুৎ আর নিরাপদকে খবর পাঠিয়ে ডেকে আনা গেল। এ বাড়িতে এত ভিড়ের মধ্যে কোনও কাজ হবে না, তাই মহাদেব মিস্তিরির পুকুরের বাঁধানো ঘাটে গিয়ে

বসল সুলেখা। মাধবের মুখ থেকে সমস্ত বিবরণটা আবার শুনে যাচাই করে নিল, কতটা সত্যি, কতটা অতিরঞ্জিত। মাধব যেখানে দ্বিধা করছিল, সেখানে খেই ধরছিল নিরাপদ।

সব শোনার পর সুলেখা অত্যন্ত পরিষ্কার উচ্চারণে বলল, বেশ, এবার আমি আপনাদের বলছি যে, আপনারা চক্রান্ত করে মনোরঞ্জনকে খুন করে তার লাশনদীতে ভাসিয়ে দিয়ে এখানে এসে রটিয়ে দিয়েছেন যে তাকে বাঘে নিয়ে গেছে।

ওরা চারজন স্তম্ভিতের মতন চেয়ে রইল সুলেখার দিকে। এই লেখাপড়া জানা, চশমা-পরা মেয়েছেলেটি এ কী সর্বনাশের কথা বলে?

নিরাপদ প্রায় তোতলাতে তোতলাতে বলল, আমরা ..আমরা মনোরঞ্জনকে খু..খুন করিছি? কেন?

সে আপনারাই ভাল জানেন!

আপনি এ কী বলছেন দিদিমণি। মনোরঞ্জন আমাদের বন্ধু, তাকে হঠাৎ কেন খুন করতে যাব?

বন্ধু বুঝি কখনও বন্ধুকে খুন করেনা? শেফালির সঙ্গে বিয়ে হবার আগে সুরেন্দ্রর সঙ্গে নিরাপদর গলায় গলায় বন্ধুত্ব ছিল না?

সে-নিরাপদ অন্য নিরাপদ, অন্য গ্রামের! সুরেন্দ্রকে খুন করে চালান হয়ে গেছে। তবু দিদিমণির মুখে খুনি নিরাপদর নাম শুনে এই নিরাপদর বুক কেঁপে ওঠে। তার ইচ্ছে করে দিদিমণির পা দুটি চেপে ধরতে।

নিজের স্বভাব অনুযায়ী মাধব তীব্র চোখে চেয়ে আছে সুলেখার দিকে। সে ধরেই রেখেছিল, মাস্টারমশাইয়ের বউ কো-অপের ধারের প্রসঙ্গ তুলবেন। কিন্তু এ আবার কোন নতুন ঝামেলা? তবু তার অভিজ্ঞ কানে যেন মনে হয়, দিদিমণি মুখে যা বলছেন, আসলে তা বলতে চাইছেন না।

আপনি কী কইতাছেন খুইল্যা কন তো! একই গেরামের এক চাষিরে শুধাশুধি খুন করব, আমাগো কি মাথা খারাপ হইছে?

বিদ্যুৎ বলল, মনোরঞ্জনকে বাঘে নিয়ে গেল, আমরা চোখের সামনে দেখিছি। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করতে পাইরল না।

সুলেখা বলল, যে-বনে বাঘ নেই, সেবন থেকে একটা জলজ্যান্ত মানুষকে বাঘে ধরে নিয়ে গেল? একথা কেউ বিশ্বাস করবে? তোমরা এই ক'জন ছাড়া আর কেউ সাক্ষী আছে?

এবার দু-তিন জন এক সঙ্গে বলে উঠল, আছে, আছে। দাউদ শেখ আর তার দলের লোকজন ছিল –

সুলেখা বলল, তাই যদি সত্যি হয়, তোমরা সেকথা ফরেস্ট অফিসে জানিয়েছ? থানায় খবর দিয়েছ?

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। বাদা অঞ্চলে বাঘে মানুষ ধরার সংবাদ হাওয়ার আগে রটে যায়। ফেরার পথে যতগুলো নৌকোর সঙ্গে দেখা হয়েছে সবাই শুনেছে। তারাই তো বার্তাবাহক। এ ছাড়া দত্তফরেস্ট অফিসে আসবার পথে ওরা থেমে এসেছে। সেখানকার বাবুরা জানেন।

কিন্তু কানে শোনা খবর দিয়ে কোনও সরকারি অফিসের কাজ চলে না। সেজন্য সুলেখা তৈরি হয়েই এসেছে। কাঁধের ঝোলানো ব্যাগ থেকে কাগজ কলম বার করে সে বললে, থানায় আর ফরেস্ট অফিসে তোমাদের সকলের সই করা লিখিত দরখাস্ত দিতে হবে। তারপর সেই দরখাস্তের কপি পাঠাতে হবে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ। সরকার বাঘ পোষার জন্য অনেক টাকা খরচ করছেন, সেই আদুরে বাঘ যদি কোনও মানুষ মারে, তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে সরকারকে। তা ছাড়া, যে-জঙ্গলে কাঠ কাটার জন্য সরকার পারমিট দিয়েছেন, সেখানেও যদি বাঘ চলে আসে, তাহলে সেই দায়িত্ব সরকারের কাঁধেই বর্তায়।

বাংলায় দরখাস্তের বয়ান লিখে ওদের পড়ে শোনাল সুলেখা।

অন্যরা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেও মাধব জিজ্ঞেস করল, ক্ষতিপূরণ কে পাবে? আমরা কিছু পামু? আমাগো কি ক্ষতি কম হইছে।

সুলেখা বলল, আপনাদের কি নিজেদের কারুর নামে পারমিট আছে? নেই? আপনারা ভাড়া খাটা লোক, আপনাদের কিছু দেবেনা। মনোরঞ্জনের জন্যই কতটা কী পাওয়া যাবে, কে জানে। তবু চেষ্টা তো করতে হবে।

মাধব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, সবদিক থেকেই হেরে যাওয়ার ব্যাপার। কেন যে ছেলে-ছোকরাদের কথায় সে নেচে উঠেছিল! সই দিয়েই মাধব উঠে পড়ল। তার তো বসে থাকলে চলবে না, তাকে দিনের খোরাকি জোগাড় করতে হবে।

সাধুচরণের সই না পেলে চলবে না। সে কোথায় লুকিয়ে আছে, বিদ্যুৎ জানে। সে গিয়ে ডাকতেই সুড় সুড় করে চলে এল সাধুচরণ।

সে এসেই টিপ করে প্রণাম করল সুলেখার পায়ে। সুলেখা একটুক্ষণ বিস্মিত ভাবে তাকিয়ে রইল সাধুচরণের মুখের দিকে। সে জানেন, তার স্বামী এই লোকটিকে বিশেষ পছন্দ করে। সাধুচরণকে জমি চাষের জন্য ঋণ দিতে চেয়েছে পরিমল, এমনকী একটা চাকরি পাইয়ে দেবারও আশ্বাস দিয়েছে, তবু এই লোকটি তাদের বাড়িতে যেতে চায় না কেন? দশবার খবর পাঠালে একবার আসে।

সাধুচরণ অনুতপ্তকণ্ঠে বলল, মাস্টারমশাইকে বলবেন, আমি কালই ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব।

সুলেখা জিজ্ঞেস করল, মনোরঞ্জনের বাবার নিজস্ব জমি কতখানি?

তিন বিঘে না চার বিঘে রে নিরাপদ?

তিন বিঘেটাক হবে।

সুলেখা মনে মনে হিসেব কষে নিল। তিন বিঘে এক-ফসলি জমি চাষ করে চার জনের নারী পুরুষের একটা সংসার সারা বছর চালানো যায় না। মনোরঞ্জন ছিল জোয়ান চেহারারযুবক, সেবছরে কয়েক মাস জন-মজুরি খেটে কিংবা মাঝের সিজনে বাগদা-পোনা ধরে আরও কিছু টাকা রোজগার করত। মনোরঞ্জনের বাবা বিচরণ যথেষ্ট বৃদ্ধ, তার পক্ষে একা নিজের জমি চষে ওঠাই শক্ত। পরিবারের আর তিন জনই স্ত্রীলোক। এ ছাড়া বিচরণকে শিগগিরই মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। জমি বিক্রি না হলে মেয়ের বিয়ে হয় না।

সুলেখার বুকের ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। জ্বর বাড়লে এ-রকম হয়। অনেকখানি পথ হেঁটে ফিরতে হবে।

মনোরঞ্জনের বাড়িতে আবার তাঁকে যেতে হল একবার। আলাদা একটি দরখাস্তে বাসনার সই লাগবে। বাঘের মুখে নিহত ব্যক্তির পত্নী হিসেবে সে সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন করছে।

কাজ সেরে উঠে দাঁড়িয়ে সে বাসনার দিকে চেয়ে নরম কণ্ঠে বলল, তুমি আমার সঙ্গে যাবে, না এখানেই থাকতে পারবে?

এই একটি মাত্র সহানুভূতির কথায় বাসনার শোকসাগর আবার উত্তাল হয়ে উঠল। সে সুলেখাকে জড়িয়ে ধরে আকুল ভাবে কাঁদতে কাঁদতে বলল, ও দিদিমণি, আমাকে এ যমপুরীতে ফেলে যাবেন না। ও দিদিমণি!

তাহলে তুমি চলো আমার সঙ্গে।

কিন্তু মনোরঞ্জনের শ্রাদ্ধ-শান্তি হবার আগেই তার বিধবা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, তা-ও কি হয়? সবই হয়, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

ডলি যখন বাসনাকে সহ্য করতে পারছেই না, তখন কয়েকটা দিন অন্তত দু’ জনের দূরে দূরে থাকাই ভাল। বিষ্টুচরণ ও প্রতিবেশী স্ত্রীলোককে এই কথা বোঝাল সুলেখা। সে জয়মণিপুরের মহিলা সমিতিতে দু-এক দিন থাকুক, দরকার হয় সেখান থেকে তাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। শ্রাদ্ধের দিন না হয় এখানে আসবে আবার!

দুখানা করে শাড়ি-ব্লাউজ-শায়া পুঁটলিতে বেঁধে নিয়ে বাসনা চলল সুলেখার সঙ্গে। এক দল লোক অকারণেই আবার আসতে লাগল পিছুপিছু। এত হই-হল্লায় বিরক্ত বোধ করছে সুলেখা, কিন্তু সে জানে, কিছু বলে লাভ হবে না। হাতে কারুর কোনও কাজ নেই বলেই এ-রকম একটা উত্তেজক ঘটনা ওরা তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে দিতে চায় না। মাথার ওপর গন গন করছে রোদ। যদি দু-এক দিন আগে বৃষ্টি নামত, তাহলে আর এত লোক হত না, অনেকেই ব্যস্ত হয়ে উঠত মাঠের কাজে।

ঠিক সময়ে বৃষ্টি নামলে মনোরঞ্জন আর তার বন্ধুরা হতো যেতই না জঙ্গলে। অকালে-বেঘোরে প্রাণটা দিতে হত না তাকে। প্রকৃতির সামান্য অন্য মনস্কতার ওপরেও অনেকখানি নির্ভর করে মানুষের নিয়তি।

খেয়াঘাটেও এত ভিড় জমল যে নৌকোয় ওঠাই মুশকিল। সবাই বাসনাকে দেখতে চায়। যে-মানুষটাকে কয়েক দিন আগে বাঘে খেয়েছে, তার যুবতী বিধবা স্ত্রীও তো কম দর্শনীয় নয়!

ছায়া ঢলে-পড়া শেষ বেলায় বাড়ি ফিরে সুলেখা দেখল, জ্বরের ঘোরে পরিমল অজ্ঞান হয়ে আছে। তাঁর কপালে জলপট্টি লাগিয়ে পাশে বসে হাওয়া করছে ইলা।

দ্বিতীয় অভিযান

এখনও কিছু কাজ বাকি আছে মাধবের, দলপতি হিসাবে তারই দায়িত্ব। আবার ফিরে যেতে হবে জঙ্গলে। মনোরঞ্জনের লাশের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা, তার জন্য খোঁজ করতেই হবে প্রাণপণে। লাশের চিহ্ন যদি পাওয়া যায় তো ভালই, না পেলেও একটা ডাণ্ডা পুঁতে তাতে উড়িয়ে দিতে হবে মনোরঞ্জনের নামে পতাকা। যদি কারুকে বাঘে নেয়, তারপর তার সঙ্গীরা যদি এই শেষ কর্তব্যটুকু পালন না করে, তবে তারা নরকে যায়।

দ্বিতীয় বার যাত্রার জন্য মহাদেবমিস্তিরি নৌকো ভাড়া নেবে না। গ্রামের প্রত্যেক পরিবার থেকে কয়েক মুঠো করে চাল দেবে এই অনুসন্ধান দলটির খোরাকির জন্য। দুর্গাপুজোর ফান্ড থেকে কিছু নগদ টাকাও পাওয়া যাবে পথখরচা হিসেবে। নাজনেখালির পাশেই একটি মাছের ভেড়ি আছে। ভেড়িটির মালিক আগে ছিল বসিরহাটের এক ব্যবসায়ী। পরিমল মাস্টারের পরামর্শে এবং নানা কৌশলে সেই ব্যবসায়ীটির ইজারা নষ্ট করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন ভেড়িটির মালিক গ্রামের সবাই, ওই মাছ বিক্রির টাকায় হয়েছে দুর্গাপুজোর ফান্ড। তাছাড়া বছরে এক দিন ওই ভেড়ি থেকে যার যত খুশি মাছ ধরে বিক্রি করতে পারে।

আজকাল নাটক নভেলে, সিনেমা-থিয়েটারে ফরেস্ট অফিসের বড়বাবু কিংবা থানার দারোগাকে ঘুষখোর, বদমাস, অত্যাচারী এমনকী রক্তপায়ী দানব হিসেবে দেখানোই নিয়ম। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, এখানকার ফরেস্ট অফিসের রেঞ্জারবাবুটি অতি নিরীহ, সাদাসিধে, ভাল মানুষ? জয়নন্দন ঘোষাল মানুষটি সত্যিই তাই। দারোগার কথায় আমরা পরে আসছি।

জয়নন্দন ঘোষালের দোহারা চেহারা, মধ্যবয়স্ক, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, চোখের মণি দুটো বেড়ালের মতো। এই ধরনের মানুষ সচরাচর খুব ধূর্ত হয়ে থাকে, কিন্তু ইনি বরং একটু বেশি সরল, আড়ালে অনারা যাকে বোকা বলে। কণ্ঠস্বর নরম ও শান্ত। জয়নন্দন

ঘোষালের এক মামা তাঁকে এই বন বিভাগের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন। এই রকম মানুষের পক্ষে যে-কোনও চাকরিই সমান। বিয়ে করেছিলেন যথাসময়ে। উত্তর বাংলায় যখন পোস্টেড ছিলেন, তখন তাঁর স্ত্রী এক চা-বাগানের ম্যানেজারের সঙ্গে নষ্ট হয়। অতি দুর্ধর্ষ ছিল সেই চা-বাগানের ম্যানেজারটি, গুলি করে মানুষ খুন করে ফেলা তার পক্ষে কিছুই নয়। বউ গৃহত্যাগ করার পর জয়নন্দন সম্পূর্ণ নারীবিমুখ হয়ে ধর্মের দিকে ঝুঁকেছেন। দু'বেলা পুজো-আচ্চা করেন। সেই জন্য এই নদী-জঙ্গলের মধ্যে নির্জন বাস তাঁর ভালই লাগে। টাকা-পয়সার দিকে তার লোভ নেই, তার নিচের কর্মচারীরা ঘুষ-ঘাস নেয় নিশ্চয়ই, সে-দিকে তিনি নজর দেন না, কারণ দিলেও কোনও লাভ হয় না। সরকারি অফিসে সহকর্মীদের কে কবে দমন করতে পেরেছে।

জয়নন্দন ঘোষাল খবর পাঠালেন যে, তিনি নিজেই সার্চ পার্টি নিয়ে যাবেন তিন নম্বর ব্লকে। মাধব মাঝির দল তাঁর সঙ্গেই চলুক। সজনেখালির ফরেস্ট অফিস বড় অফিস, তাদের লঞ্চ আছে, কিন্তু জয়নন্দন ঘোষের অধীনে কোনও লঞ্চ নেই। তাকে যেতে হবে নৌকোয়।

পাশাপাশি দুটো নৌকো চলল।

মাধবের শরীরে একটা অস্থির অস্থির ভাব। জয়নন্দন ঘোষালের চোখে চোখ রেখে সে কথা বলতে পারে না। মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। অন্তরে একটা চিন্তা পোকার মতো কুরে কুরে খাচ্ছে। তিন নম্বর ব্লকে তো হাজার খোঁজাখুঁজি করেও মনোরঞ্জনের লাশ পাওয়া যাবে না! ওইখানে উড়িয়ে দিতে হবে মনোরঞ্জনের নামে পতাকা? সে নিজে গুণিন হয়ে এমন ফেরেববাজি করবে! ফরেস্টবাবুসঙ্গে যেতে চেয়েই তো যত গোলমাল বাধালেন। নইলে সে ঠিক করেছিল, আর কেউ না যাক, সে নিজেই অন্তত আর একবার সাত নম্বরে গিয়ে মনোরঞ্জনের লাশের খোঁজ করবে। চুপি চুপি সেখানে উড়িয়ে দিয়ে আসবে আর একটা পতাকা। কিন্তু ফরেস্টবাবুর নৌকো সঙ্গে থাকলে সে যায় কী করে?

একবার চুপি চুপি সে জিজ্ঞেস করেছিল, ও সাধু, ফরেষ্টের বড়বাবুরে খুইলে কবি নাকি সব সইত্যি কথা? এ বাবুভাল লোক।

সাধুচরণ উত্তর দিয়েছিল, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে মাধবদা? তাহলে একবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে না? আমরাও বিপদে পড়ব, আর মনোরঞ্জনের বাপ কোনও ক্ষতিপূরণ পাবে?

যা হবার তা তো হইয়েই গিয়েছে... এখন যদি সব বুঝায়ে বলি..ইনি ভাল লোক, নিশ্চয় সব বোঝবেন।

চুপ করো, একদম চেপে যাও মাধবদা। যতই ভাল লোক হোন, তোমার কথায় কি ইনি মিথ্যে রিপোর্ট লিখবেন? সাত নম্বরে লাশ পাওয়া গেলে ইনি লিখবেন তিন নম্বরে? খবরদার একেবারে মুখ খুলো না। দেখোনি, সাহেবের অন্য কর্মচারীরা আমাদের দিকে কেমন টেরিয়ে টেরিয়ে তাকায়।

একথা ঠিক, জয়নন্দন ঘোষালের নিচের লোকেরা কেউই মাধবদের বিশ্বাস করেনি। তিন নম্বর ব্লকে বাঘ, মামদোবাজি, তারা সব জানে! ঘোষালবাবু যদি সঙ্গে না আসতেন, তাহলে তারা এই লোকগুলোকে চুষে নিঙড়ে নিত। ঘোষালবাবু বোকাসোকা লোক বলেই রিপোর্ট নিতে চলেছেন তিন নম্বরে সত্যি বাঘ এসেছে কিনা। যদি বাঘের সন্ধান পাওয়া যায়, ও জায়গাটাকে নোটিফায়েড এরিয়া বলে ঘোষণা করতে হবে, কাঠ কাটার নৌকো আর ও-দিকে যেতে পারবে না। গভর্নমেন্টকেও খবরটা জানাতে হবে।

জয়নন্দন ঘোষালকে খাতির করবার জন্য সাধুচরণ দুপুরবেলা বলল, সার, আমারা পার্শে মাছের তরকারি বেঁধেছি, একটু চেখে দ্যাখবেন নাকি আমাদের রান্না?

জয়নন্দন পাশের নৌকো থেকে বললেন, আমি তো বাবা মাছ-মাংস খাই না। আমি নিরামিষ খাই।

ফরেস্ট অফিসের বড়বাবুনিরামিষ খান শুনে সাধুচরণরা সকলে থহয়ে যায়। শোনা যায়, আগের বড়বাবুর মাংসের লোভ এত বেশি ছিল যে তিনি নিজে হরিণ মারতেন। এত বড় বে-আইনি কাজটা অন্য যে কেউ করলে শাস্তি দেবার ভারও ছিল তারই হাতে।

জয়নন্দন জিজ্ঞেস করলেন, আর কী রেঁধেছ তোমরা?

আর বিশেষ কিছু বলার মতো নয়। ভাত, ডাল, আলু সেদ্ধ মাখা আর পার্শে মাছের ঝাল। আসবার পথে কয়েক খেপ জাল ফেলে কিছু এই ছোট পার্শে পাওয়া গেছে।

আলু সেদ্ধ কি পেঁয়াজ-লঙ্কা দিয়ে মেখেছ? তবে তাই দাও এক দলা, দেখি কেমন মেখেছ?

ও-নৌকো থেকে বন্দুকধারী ফরেস্ট গার্ড এদের দিকে কটমটিয়ে তাকায়। বড়বাবু মাছ খান না, কিন্তু তারা তো খায়। তাদের একবার অনুরোধ করা হল না পর্যন্ত।

ভাটার সময় দুটো নৌকো পাড়ের কাছে থেমে থাকে পাশাপাশি। কয়েকটা শামুকখোল পাখি উড়ে গেল খুব কাছ দিয়ে। গুলতিটা সঙ্গে আনলেও বার করতে সাহস গেল না নিরাপদর। নিরামিষভোজী বড়বাবুর সামনে পাখি-শিকারও নিশ্চয়ই দোষের হবে।

সময় কাটাতে হবে তো, তাই নিরাপদ একটা গান ধরল আপন মনে।

অগো সুন্দরী
তুমি কার কথায় করেছে মন-ভারী।
অগো সুন্দরী
যেখানে সেখানে থাকি অনুগত তোমারই
অগো সুন্দরী...

হঠাৎ মাঝপথে গান থামিয়ে অপ্রস্তুতের মতো চুপ করে গেল নিরাপদ। তার সঙ্গীরা তার দিকে বিস্ফোরিত চোখে নিঃশব্দে চেয়ে আছে। ইস, সে এমন ভুল করল?

এই গানটা মনোরঞ্জন গেয়েছিল যাবার দিনে। বোধহয় নদীর বুকে ঠিক এই রকমই জায়গায়। মাঝনদীতে খোলা হাওয়ায় গলা ফাটিয়ে গান গাওয়ার স্বভাব ছিল মনোরঞ্জনের।

গানটা এত ভাল লেগেছিল যে, ওরা সবাই বার বার গাইতে বলেছিল মনোরঞ্জনকে। শুনে শুনে নিরাপদর মুখস্থ হয়ে গেছে, তবু এটা মনোরঞ্জনের গান, এ গান এখন আর অন্য কেউ গাইতে পারে না। নিরাপদ নিতান্ত অন্যমনস্ক ছিল বলেই –।

পাশের নৌকো থেকে জয়নন্দন বললেন, থামলে কেন, গাও না! বেশ তো গলাটি তোমার। ঠাকুর-দেবতার গান জানো না?

নিরাপদকে আবার গাইতে হল। এবার তার গলার আওয়াজ বদলে গেছে, বিষণ্ণ আর গম্ভীর।

হরি হরায়ে নমো কৃষ্ণ যাদবায়ে নমো
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমো
একবার বল রে...
গোপাল গোবিন্দ নাম, একবার বল রে...

বাঃ বেশ! আর একটা?

একবার গলা খাঁকারি দিয়ে নিল নিরাপদ –

দেশ জননী গো তোমার চরণে
এনেছি রক্তের ডালি...

'বঙ্গাধিপ পরাজয়' নামে যাত্রার গান, সবটা নিরাপদর মনে নেই। তাছাড়া এমনই করুণ রসের গান যে, গাইতে গাইতে গলা ধরে এল তার। শুধু নিরাপদ নয়, এখন এ নৌকোর সকলেরই খুব মনে পড়ছে মনোরঞ্জনের কথা।

তিন নম্বর ব্লক যখন মাত্র আর দু'বাঁক দূরে, সেই সময় হঠাৎ বৃষ্টি নামল ঝিরি ঝিরি করে।

আনন্দে নেচে উঠতে ইচ্ছে করল মাধব আর তার সঙ্গীদের। বৃষ্টি মানেই আনন্দ। বৃষ্টি মানে চাষের শুরু। বৃষ্টি মানে নতুন ভাবে বাঁচার আশা। অবশ্য, এই বৃষ্টিকে ঠিক বিশ্বাস করা যায় না, এ-দিকটা সমুদ্রের অনেক কাছে, এদিকে ঘন ঘন বৃষ্টি হয়। এখানে বৃষ্টি হলেই যে তাদের গ্রামেও বৃষ্টি হবে, তার কোনও মানে নেই। তবু তো বৃষ্টি। আঃ, কত দিন বৃষ্টি ভেজা হয়নি।

এই বৃষ্টিতে আরও বেশি খুশির কারণ আছে। এরপর আর তিন নম্বর ব্লকে বাঘের পায়ের ছাপের প্রমাণ দেখাবার কোনও দরকার হবে না। বৃষ্টিতে সব ধুয়ে গেছে না? এখন মাধবের মুখের কথাই যথেষ্ট।

সামনের ট্যাঁকেই তিন নম্বর ব্লক। এখানে একেবারে ঝড়-মেশানো তুমুল বৃষ্টি। জয়নন্দন ঘোষালের ছাতা উড়ে যাবার মতো অবস্থা। ঝড়-বৃষ্টির সময় দূরের বনরাজি নীলা বড় সুন্দর দেখায়। কিন্তু তা দেখবার মতো মন এখন কারুর নেই। ওরাও নৌকো ভেড়াল, বৃষ্টিও থামল অমনিই।

এই দ্যাখেন বড়বাবু, এই যে মা বনবিবির থান। এখানে মনোরঞ্জন পূজা দিছিল। সে মানত কইর‍্যা আইছিল তো!

জয়নন্দন ঘোষাল ভক্তি ভরে গড় করলেন, তাঁর দেখাদেখি অন্য সকলেও। সাধুচরণের মনে একটি অভিমান হল মা বনবিবির প্রতি। মনোরঞ্জন তো সত্যিই পুজো দিয়েছিল, তবু মা তাকে রক্ষে করলেন না।

তারপর এই যে, এই গাছে আমরা পেরথমে কোপ দিছি। অ্যাখোনো দাগটা রইছে।

জয়নন্দন বললেন, তুমি তো বাপু গুণিন। তুমি আগে মন্ত্র পড়ে এই জঙ্গল আটক করো তো! কী জানি বলা যায় না।

যে-বনে বাঘ নেই জানা কথা, সেখানে মন্ত্র পড়ায় গুণিনের আর কী কৃতিত্ব! তবুমন্ত্র পড়তে হয় মাধবকে। শেষের দিকে সে চেঁচাতে শুরু করলে অন্যরাও যোগ দেয় সেই চিৎকারে। বন্দুকধারী গার্ডটি বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে। সে জানে, সোঁদরবনের বাঘ বড় টেঁটিয়া, লোকজনের গলায় আওয়াজ শুনলে আরও কাছে আসে। এ তো আর তরাই বনের বাঘ নয় যে, একের বেশি দু'জন মানুষ দেখলেই লেজ গুটিয়ে পালাবে।

তারপর কোন দিকে গিসলে তোমরা?

মাধব এবার সাধুচরণের দিকে তাকায়। ঠিক সাজিয়ে-গুছিয়ে মিথ্যে বর্ণনাটি দেবার ভার তার ওপর।

সে শুরু করল, এই যে বড়বাবু, এই বাইন গাছটার মাথায় কাঁকটা বসেছিল। নিরাপদ চেষ্টা করে মারতে পারল না। তারপর আমরা সবাই লাইন করে...।

যে-বনে বাঘ নেই, সেবনে এরপর অনেক খোঁজাখুঁজি করা হল বাঘের চিহ্ন! যে-বনে মনোরঞ্জন বাঘের মুখে পড়েনি, সেই বনে খোঁজা হল তার লাশ। মনোরঞ্জন খালি গায়ে নেমেছিল জঙ্গলে, কিন্তু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের এক জন গার্ড একটা ঝোপের মধ্য থেকে আবিষ্কার করল তার গেঞ্জি। তাতে আবার ছিটে ছিটে রক্ত মাখা। মাধবরা সবাই এক বাক্যে সাক্ষী দিল ওই গেঞ্জি মনোরঞ্জনেরই। নিরাপদ ওই গেঞ্জিটা লুকিয়ে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু লুঙ্গি আনতে পারেনি প্রাণে ধরে।

জয়নন্দন ঘোষাল তাতেই সন্তুষ্ট। কিন্তু বাঘ যে আবার তিন নম্বর ছেড়ে চলে গেছে, তা-ও প্রায় নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। এত হাঁকডাকেও বাঘের কোনও সাড়া নেই। সমুদ্রের মতো এত বড় চওড়ানদী, বাঘ তা-ও সাঁতরে আসে। কুমিরকামটের ভয়ও নেই বাঘের। জানোয়ারের মতো জানোয়ার বটে!

ফেরার পথে দুটো নৌকো আলাদা হয়ে গেল।

মাধব বলল, আইলামই যখন, তখন দুই-এক বোঝা কাঠ কাইট্যা লইয়া যাই, কী কস তোরা?

নিরাপদ সাধুচরণরা একটু কিন্তু কিন্তু করে। মহাদেব মিস্তিরি বিনা পয়সায় এই নৌকো দিয়েছে আসা-যাওয়ার বাঁধা সময়ের করে। দেরি হলে সে ধরে ফেলবে।

মাধব বলল, সবাই মিলে ঝপাঝপ হাত লাগালেই তো চাইর-পাঁচ বোঝা কাঠ হয়। বোঝোস না তোরা, ফিরা গিয়া খামু কী?

কিন্তু কাঠ নিয়ে গেলেই তো ধরে ফেলবে!

সে-চিন্তা নাই। যাওনের পথে ছুটো মোল্লাখালিতে নৌকো ভিড়ায়ে কাঠগুলা দাউদশাখের গুদামে ফেলাইয়া গ্যালেই হবে!

খাঁড়ি দিয়ে খানিকটা ঢুকে ওরা কাঠ কাটতে শুরু করে দেয়। বুদ্ধি করে দু'খানা কুড়াল এনেছে মাধব। বাইন-গরাল-হেঁতাল যা সামনে পায় তাতেই ঝপাঝপ কোপ লাগায়। জ্বালানি কাঠ তো জ্বালানিই সই। যা পাওয়া যায়।

বাঘ নেই, তবুবাঘের ভয়ে গা ছম ছম করে নিরাপদর। সব সময় মনে পড়ছে মনোরঞ্জনের কথা। মনোরঞ্জন ভূত হয়ে কাছাকাছি ঘুরছে না তো? কেন মরতে এসেছিলি মনোরঞ্জন, তোকে তো কেউ ডাকেনি।

পরদিন ওরা গাঁয়ে ফিরল সন্ধেসন্ধি। ছোট মোল্লাখালিতে কাঠনামিয়ে দু-চারটে টাকা যা পেয়েছে, তা নিয়ে অনেক দিন পর ওরা ধুম মাতাল হল। সাঁওতাল পাড়ার দু'টাকায় এক হাঁড়ি হাঁড়িয়া, তাই তিন-চার হাঁড়ি টেনে ওরা গড়াগড়ি দিতে লাগল নিশুতি অন্ধকারের মধ্যে হাটখোলায়।

নিরাপদ ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল, ওরে মনোরঞ্জন তুই কোথায় গেলি? তুই ছাড়া কে হিরো হবে আমাদের যাত্রায়? ওরে, তোকে আমি একবার ক্যানিং-এর খানকি পাড়ায় নিয়ে গেলাম, কত আনন্দ হল সেবার! ওরে মনা, মনা রে–

.

অরুণাংশুর মনোবদনা

জ্বরের ঘোরে দু'দিন প্রায় বেহুঁশ হয়ে রইল পরিমল মাস্টার।

যেহেতু এ-দিকে গোসাবা ছাড়া কোথাও ডাক্তার নেই, তাই সুলেখা নিজেই হাফ-ডাক্তার। গ্রামের লোকদের টুকিটাকি অসুখে সে নিজেই ওষুধ দেয়, হোমিওপ্যাথিক, অ্যালোপ্যাথিক দুরকমই।

পরিমলের এতখানি অসুখ হওয়ায় সুলেখার জ্বরটা যেন আপনা থেকেই বিনীত ভাবে সরে গেল। প্রথম রাতে স্বামীকে নিজেই ওষুধ দিল। পরদিন বেলাবেলি এলেন ডাক্তার। তাঁর সন্দেহ, পরিমল মাস্টারের টাইফয়েড হয়েছে। অবশ্য রক্ত পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

অসুখ হয়েছে বলেই যে হুট করে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে, এমন মনে করে না সুলেখা। তার মাথা ঠাণ্ডা, তার বাইরের চাঞ্চল্য কদাচিৎ দেখা যায়। এই যদি সুলেখার এরকম অসুখ হত, তাহলে পরিমল খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়ত। ছেলে মেয়ের অসুখ হলে সেই ব্যস্ততা আরও চারগুণ হয়।

মাঝে মাঝে চোখ মেলে পরিমল আচ্ছন্ন ভাবে জিজ্ঞাসা করেন, তারপর কী হল নাজনেখালিতে? ছেলেটার নাম যেন কী? কোন বাড়ির ছেলে?

সুলেখা জানে, এই সময় পুরো কাহিনিটি তার স্বামীকে জানানো বৃথা। জ্বরতপ্ত মাথায় কোনও চিন্তা দানা বাঁধেনা। সে সংক্ষেপে দু-চারটে কথা বলে, তার মধ্যেই আবার ঝিমুনি এসে যায় পরিমলের।

মধ্যরাত্রে হঠাৎ জেগে উঠে পরিমল একবার জিজ্ঞেস করল, অরুণাংশু এসেছে?

সুলেখা বলল, এই সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে অরুণাংশুবাবুর আসবার দরকার কী?

একটা লঞ্চের শব্দ শুনতে পাচ্ছি যেন?

ওটা পুলিশের লঞ্চ। তুমি ঘুমোবার চেষ্টা করো তো।

না, দেখো, হয়তো ওই লঞ্চেই অরুণাংশু আসছে। ও সব পারে।

এলে আর কী হবে! থাকবে! তবে তোমার বন্ধু যদি এবার এসে এখানে মদ খায় কিংবা হল্লা করে, তা হলে স্পষ্ট দু’কথা শুনিয়ে দেব।

অ্যাঁ? কী বলছ?

অন্ধকারের মধ্যে স্বামীর মাথায় হাত রেখে সুলেখা নরম গলায় বলল, আর একবার জলপট্টি লাগাব? ঘুম ভেঙে গেল কেন হঠাৎ?

একটু জল দাও, বড্ড তেষ্টা।

খানিকটা বাদে পরিমল আবার বলে উঠল, বুঝলে না, এটা ওদের নেশা...এই নদী ওদের টানে, জঙ্গল টানে...ওরা যাবেই।

কাদের কথা বলছ?

ওই যে ওরা। যতই তুমি নিরাপত্তা দাও, পেটে খাবার দাও, তবু বিপদের ঝুঁকি নেওয়া মানুষের ধর্ম। সেই জন্য ইচ্ছে করে ওরা বাঘের মুখে যায়...।

ঘুমের ওষুধ দেওয়া ঠিক হবে কিনা বুঝতে না পেরে সুলেখা নিঃশব্দে হাত বুলিয়ে যেতে লাগল পরিমলের পাতলা হয়ে আসা চুলের মধ্যে। আপন মনে কিছুক্ষণ কথা বলে থেমে গেল পরিমল।

পরদিনও জ্বর রইল একশো পাঁচ।

প্রলাপ বকার মতো মাঝে মাঝে কথা বলে যেতে লাগল স্ত্রীর সঙ্গে, দু-একবার শোনা গেল অরুণাংশুর নাম। কিন্তু অরুণাংশু আসেওনি। আর কোনও খবরও দেয়নি।

দ্বিতীয় দিনে ডাক্তার জানালেন যে পরিমলের রক্তে টাইফয়েডের জীবাণু পাওয়া যায়নি, জ্বর রেমিশানের জন্য তিনি পালটে দিলেন ওষুধের নাম। সে-ওষুধ অবশ্য গোসাবায় এখন পাওয়া যাচ্ছে না। বনমাতা লঞ্চের সারেংকে অনুরোধ করা হল, ক্যানিং থেকে প্রথম ফেরার লঞ্চের সারেং-এর হাতে যেন ওই ওষুধ পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বাসনাকে মহিলা সমিতির হস্টেলে এনে রেখেছে সুলেখা। এই দু'দিন তার প্রতি সে বিশেষ কোনও মনোযোগ দিতে পারেনি। ওখানে অন্য মেয়েরা আছে, তারা দেখবে। তাছাড়া এখন এ মেয়েটির কান্নারই সময়, একা নিজের ঘরে শুয়ে কাঁদুক।

তৃতীয় দিনে শুরু হল অন্য রকম উৎপাত।

মামুদপুর থেকে বাসনার বাবা এবং কাকা এসে হাজির। প্রথমে তারা গিয়েছিল নাজনেখালিতে, সেখানে মেয়ের শাশুড়ির কাছ থেকে গালমন্দ খেয়ে অপমানিত হয়ে তারা দাপাদাপি করতে লাগল জয়মণিপুরে এসে।

মহিলা সমিতির সামনে দাঁড়িয়ে তারা গালাগালির ভাণ্ডার উজার করে দিল। বাসনার বাবার চেয়ে তার কাকারই গলার জোর বেশি। কাকার নাম নিতাইচাঁদ, মুখে মোল্লাদের মতন দাড়ি, লুঙ্গির ওপর নীল ছিটের জামা পরেছে, বাঁ-হাতে একটা রুপোর তাগা বাধা।

তার তুলনায় ধুতি ও গেঞ্জি পরা বাসনার বাবা শ্রীনাথ অনেকটা নিরীহ। নিতাইচাঁদ আর শ্রীনাথ কিন্তু পৃথক অন্ন, কিন্তু এই শোকের সময় তারা এক হয়ে গেছে।

তাদের গালাগালির মূল বক্তব্য, তাদের মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি থেকে ঠেলে এখানে পাঠানো হয়েছে। তাদের মেয়ে কি অনাথ? এখনও মামুদপুরে নিতাইচাঁদ সাধুকে সবাই এক ডাকে চেনে। কী ভুল করেই না তারা এক হারামজাদার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল মেয়ের।

সেই গালাগালি শোনবার জন্য এখানেও একটা ভিড় জমেছে। শোকের ব্যাপার বলেই অন্য সবাই চুপ করে আছে, নইলে তারাও নানা রকম মন্তব্য করতে ছাড়ত না। শোকে-দুঃখে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়। তখন কত কী বলে, সে-সব কথা ধরতে নেই।

শুধু বদন দাস একবার বলল, ও দাদারা, একটু আস্তে কথা বলুন। মাস্টারমশাইয়ের খুব অসুখ।

সে কথা ওরা কানেই তুলল না।

ওই চেঁচামেচি অসহ্য লাগছে সুলেখার। স্বামীর শোওয়ার ঘরটায় জানলা-দরজা বন্ধ করে রেখেছে। যাতে তার কানে কিছুনা যায়। তবু পরিমল মাস্টার একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, ও কীসের গোলমাল? আজ এখানে গ্রাম-সভা বুঝি?

শেষ পর্যন্ত আর থাকতে পারল না সুলেখা। সে ওদের সামনে এসে বলল, আপনারা এখানে এত চেঁচামেচি করছেন কেন? আপনাদের মেয়েকে কি আমি জোর করে এনেছি? আপনাদের ইচ্ছে হলে তাকে নিয়ে চলে যান।

এর উত্তরে নিতাইচাঁদ আরও জোরে বলল, কোন সাহসে ওরা বলে যে আমাদের মেয়ে অলক্ষ্মী? ভাতারখাগী? ছোটলোকের বাড়ি তো, জানে না আমরা কত বড় বংশ, আমাদের মেয়ে কোনও দিন মুখ তুলে কারোর সঙ্গে কথাটি বলে না...।

সুলেখা ক্লান্ত ভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এ-সব কথা তার কাছে বলার কী মানে হয়? মনের মধ্যে দুশ্চিন্তা না থাকলে সে ধীরে সুস্থে বোঝাবার চেষ্টা করত। এখন ভাল লাগছে না। সে ধমক দিয়ে বলল, চেঁচামেচি করতে বারণ করলুম না? আপনাদের মেয়েকে নিয়ে যেতে চান কি না বলুন।

নিতাইচাঁদ বলল, চোখ রাঙাচ্ছেন কাকে? আমরা আপনার খাই না পরি? না আপনাদের কো-অপের ধার ধারি? আমাদের মামুদপুরেও কো-অপ আছে। এখানে প্রজেক্টের টাকা কীভাবে খরচা হয়, তা সবাই জানে...।

পরিমলমাস্টার থাকলে সে ওদের দুজনের কাঁধে হাত দিয়ে টেনে নিয়ে যেত, রঙ্গ-রসিকতা করত, গাছতলায় বসে ওদের কাছ থেকে বিড়ি চেয়ে টানত। খানিক পরেই ওরা প্রতি কথায় ঘাড় হেলিয়ে বলত, হ্যাঁ মাস্টারমশাই, হ্যাঁ মাস্টারমশাই।

সুলেখা চলে গেল মহিলা সমিতির হস্টেলের ভেতরে। হস্টেল মানে তিনখানা চ্যাঁচার বেড়া দেওয়া ঘর, মেয়েরা চোখ গোল গোল করে শুনছে, তাদের মধ্যে গুম হয়ে বসে আছে বাসনা।

সুলেখা বাসনার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি চলে যেতে চাও, না থাকতে চাও? বাসনা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে আবার কাঁদতে শুরু করল।

সুলেখা কড়া গলায় বলল, এখন কান্না থামাও। কাঁদাকাটা করার অনেক সময় পাবে পরে। এখন থেকে তোমার ভাল-মন্দ নিজেকেই বুঝতে হবে।

বাসনা তবু কোনও কথা বলে না। ফোঁপায় শুধু।

আমার মনে হয়, এখন তোমার বাপের বাড়ি চলে যাওয়াই ভাল। এই ননী, বিমলা, ওর জিনিসগুলো গুছিয়ে দে।

দুপুর প্রায় একটা। নারী সমিতির মেয়েরা বাসনাকে না খাইয়ে এ-সময় যেতে দেবে না। শ্রীনাথ আর নিতাইচাঁদ একটু দূরে একটা খিরিশ গাছের তলায় বসে গুজুর গুজুর ফুসর ফুসর করতে লাগল। খাওয়া জুটল না ওদের। এ গ্রামে তো হোটেল নেই। আর ও-রকম ঝগড়ুটে দু'জন লোককে কোন গৃহস্থ বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে?

নদীর বুকে প্রথমে জেগে উঠল ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দ, তারপর ভ্যাঁ ভ্যাঁ হর্ন। আড়াইটের লঞ্চ। বাসনাকে সামনে রেখে শ্রীনাথ আর নিতাইচাঁদ এগিয়ে গেল লঞ্চঘাটার দিকে।

পরিমল মাস্টার এসব কিছুই জানলেন না।

সেই মেঘমালা লঞ্চ থেকেই নামল বিখ্যাত লেখক অরুণাংশু সেনগুপ্ত। সেসদ্য বিধবা বাসনাকে লক্ষ করল না। এখানে আট-দশজন যাত্রী ওঠেনামে, কে কার দিকে তাকায়! তাছাড়া এই জয়মণিপুর থেকে ওঠে ঘি-দুধের ড্রাম। বরং অরুণাংশুর দিকেই অনেকে আড়চোখে তাকাল, সে যে বিখ্যাত তা অবশ্য কেউ জানে না, কিন্তু তার মুখের দিকে এক পলক তাকালেই বোঝা যায় সে এখানকার মানুষ নয়। শহরের গন্ধ মাখা প্রাণী।

গাঢ় নীল রঙের ট্রাউজার্স, ফুল ফুল ছাপা খাদির হাওয়াই শার্ট, মাথার চুল কঁচাপাকা, দু'চোখের কোলে অনিদ্রার কালি, মুখে অসংযম ও অত্যাচারের ছাপ। লেখক হিসেবে অরুণাংশু রবি ঠাকুরের বংশধর নন। ইতিমধ্যেই কোনও কোনও ব্যাপারে মাইকেলকে ছাড়িয়ে গেছেন।

অরুণাংশু সাধারণত একা বাইরে যায় না, সঙ্গে দু-একজন বন্ধুবান্ধব থাকে, যে-কোনও জায়গায় যাত্রাপথেই সে মদ্যপান করতে শুরু করে, অল্প অল্প নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় সে জোরে জোরে হাসে। হুকুম করার সুরে কথা বলে, সব জায়গায় তার উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ করে দেয় সকলকে। যাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকে, তারাই সর্বক্ষণ সরবে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করে। অধিকাংশ লেখকই ভোগেন এই রোগে।

আজ কিন্তু অরুণাংশুর একেবারে অন্য রকম রূপ। সে এসেছে একা, দেখে যত দূর সম্ভব মনে হয় নেশা করেনি, মুখে গাঢ় বিমর্ষতা মাখানো। বাঁ-হাতের আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ঝুলছে। আগে একবার এখানে এলেও সে দিক ভুলে গেছে, লঞ্চ থেকে নেমে সে এ-দিক ওদিক তাকাতে লাগল। জোয়ারের সময়, তাই পায়ে কাদা লাগেনি।

বদন দাসকেই সে জিজ্ঞেস করল, হেডমাস্টারমশাইয়ের বাড়িটা কোথায়?

বদন দাস বলল, আসেন আমার সঙ্গে।

এই লঞ্চে যারা কলকাতা থেকে আসে, তারা খেয়েই আসে সাধারণত। খবর না দিয়ে এলে আড়াইটে-তিনটের সময় কে ভাত রান্না করে দেবে? অধিকাংশ গ্রামের মানুষই বেলা এগারোটার মধ্যে ভাত-টাত খাওয়া সেরে ফেলে। অরুণাংশু খেয়ে আসেনি, কিন্তু সুলেখার সঙ্গে দেখা হবার পর সে তা বলল না। বন্ধুর অসুখ শুনে সে গিয়ে বসল তার খাটের পাশে।

ওষুধ ও জ্বরের ঘোরে পরিমল মাস্টার অজ্ঞানের মতো ঘুমোচ্ছ।

এই যদি অন্য সময় হত, অরুণাংশুর মাথায় টলটলে নেশা থাকত, তাহলে সে এই রকম কোনও ঘুমন্ত বন্ধুর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে বলত, এই শালা, ওঠ। জ্বর-ফর আবার কী রে, লোকের এত জ্বর হয় কেন, আমার তো কোনও দিন হয় না! আজ অরুণাংশু তার বন্ধুর পাশে বসে আলতো করে একটা হাত রাখল কপালে।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সুলেখা, তোমাদের এখানে আমাকে একটা চাকরি দিতে পারবে? আমি এখানেই থেকে যেতে চাই।

এমনকী রসিকতা মনে করেও হাসল না সুলেখা। সঙ্গে সঙ্গে দু'দিকে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল, না। তারপর জিজ্ঞেস করল, চা খাবেন তো?

এখন না। আমিও একটু ঘুমোব। কোথায় ঘুমোব বলো তো?

ছেলে আর মেয়ের পড়ার ঘরটা এখন ফাঁকাই পড়ে আছে। খাটও আছে একটা, সেখানেই শোয়ার ব্যবস্থা হল অরুণাংশুর। কিন্তু শুয়েও ঘুমোল না। চিত হয়ে শুয়ে সিগারেট টেনে যেতে লাগল একটার পর একটা। সেই বিমর্ষ ভাবটা মুখে লেখেই রইল।

কদিন ধরে স্কুলে যাওয়া হচ্ছে না। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই না গেলে বেশ অসুবিধে হয়। তাই বিকেলের দিকে সুলেখা একবার স্কুলে ঘুরে আসতে গেল। কাছেই তো।

সন্ধের পরও অরুণাংশুর ঝোলা থেকে মদের বোতল বেরুল না। পরিমল জেগে ওঠার পর তার খাটের ওপর গিয়ে বসে সে চা খেল।

পরিমল প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, কীসে এসেছিস, পুলিশের লঞ্চে?

না তো!

রাত্তিরে পুলিশের লঞ্চের শব্দ পেলাম।

সময়ের হিসেবটা গুলিয়ে গেছে পরিমলের। দুপুরের লম্বা ঘুমের পর জেগে উঠে যেমন অনেক সময় মনে হয় সকাল।

আর কে কে এসেছে?

কেউ না!

মনোরঞ্জন বলে একটা ছেলের আসবার কথা ছিল না? নাজনেখালির মনোরঞ্জন। সে তোর সঙ্গে আসেনি?

সুলেখা বলল, তুমি কী বলছ? নাজনেখালির মনোরঞ্জনকে উনি চিনবেন কেন? আর সে এখানে আসবেই-বা কী করে? তাকে তো বাঘে নিয়ে গেছে!

এই প্রথম উঠল বাঘের কথা।

পরিমল মাস্টার ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, হ্যাঁ, তারপর কী হল বলো তো? ভুলেই গিয়েছিলাম। সেই যে তুমি নাজনেখালি গেলে... বিষ্টুপদর ছেলে না মনোরঞ্জন? তাকে সত্যিই বাঘে নিয়ে গেছে?

সুলেখা বলল, হাঁ। তার বউয়ের বয়েস মাত্র উনিশ-কুড়ি। এই তো মোটে ক'মাস আগে বিয়ে হয়েছে।

এরপর সুলেখা অতি সংক্ষেপে বাসনা নাম্নী মেয়েটির এই কয়েক দিনের জীবনকাহিনি শোনাল।

মাথা পরিষ্কার হয়ে গেছে পরিমল মাস্টারের। সে ঠিক বুঝতে পারল ঘটনা পরম্পরা।

সে বললেন, মেয়েটা চলে গেল? তুমি তাকে যেতে দিলে?

বাঃ, তার বাবা-কাকা নিতে এসেছে, আমি তাকে আটকে রাখব নাকি?

দেখোনা এবার কী-রকম মজা হয়।

সে হেসে উঠল হো-হো করে। সুলেখা অবাক। এমন অসুস্থ লোকের মুখে তৃপ্তির হাসি?

তুমি হাসছ?

বললাম তো, দেখোই না এবার কী মজা হবে।

অরুণাংশু আগাগোড়া চুপ। কোনও কিছুতেই তিনি উৎসাহ পাচ্ছে না। সিগারেটের শেষ টুকরোটা ঘরের মেঝেতে ফেলাই তার চরিত্রে ধর্ম, আজ কিন্তু সে মনে করে প্রত্যেকবার জানলার বাইরে ফেলে আসছেন।

প্রসঙ্গ বদলে পরিমল বলল, আমি এমন করে কাবু হয়ে পড়লাম, তোকে নিয়ে কোথাও ঘোরাঘুরি করতে পারবনা।

অরুণাংশু বলল, আমি এখানে কয়েকটা দিন চুপচাপ শুয়ে থাকবার জন্য এসেছি।

কিছু লেখবার জন্য?

না। লেখা-টেখার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক নেই।

মানে?

আমি লেখা ছেড়ে দেব। দেব মানে কী, ছেড়ে দিয়েছি। কী হবে আর লিখে।

চারদিকে তোর লেখার জয় জয়কার...কাগজ খুললেই তোর বইয়ের বিজ্ঞাপন।

দুর দুর, ও সব বাজে।

তুই দু-চারখানা বই আনিসনি আমাদের জন্য?

নাঃ।

সুলেখা ভাবল, ও অকাল বৈরাগ্য? সেই জন্যই মুখখানা শুকনো শুকনো, উদাস উদাস ভাব? তা ভালই হয়েছে, এই জন্য যদি কয়েক দিন অন্তত মদ খাওয়া বন্ধ থাকে... অন্তত এখানে তো ও-সব কিছু চলবেই না।

পরিমল বলল, না রে, অরুণাংশু তোকে সিরিয়াসলি বলছি, তুই এখানকার মানুষজনদের নিয়ে লেখ না! তোর কলমের জোর আছে, তুই কিছু দিন এখানে থেকে দেখ সব কিছু...।

না, না, না! আমি বুঝে গেছি লিখে এই পৃথিবীর কোনও কিছু বদলানো যায় না। সাহিত্য-টাহিত্য সববিলাসিতা।

পরদিন জ্বর ছেড়ে গেল পরিমলের। শরীর খুব দুর্বল, হাঁটতে গেলে মাথা ঝিমঝিম করে, তবু সে যেন অনুভব করল এবার সুস্থ হয়ে উঠবে। এই জ্বর ঝেঁকে ঝেঁকে আসে। এবার কড়া ওষুধের তাড়া খেয়ে পালিয়েছে।

অরুণাংশু সত্যিই প্রায় সারা দিন শুয়েই কাটাল। একটা বই পর্যন্ত পড়ে না।

পরিমল বলল, তুই গ্রামের মধ্যে একলা একলাই একটু ঘুরে আয় না। তোকে তো এখানে বিখ্যাত লোক বলে কেউ খাতির করে না, নিজের চোখে এদের অবস্থা দেখবি।

নাঃ, ভাল লাগছে না। গতবারে তো সজনেখালি যাওয়া হল না। এবার যাবি? ব্যবস্থা করে দিতে পারি। এক জন কারুকে সঙ্গে দেব, তোকে নিয়ে যাবে। ইচ্ছে করলে, ওখানে একটা রাতও কাটিয়ে আসতে পারিস, বাঘের দেখা না পেলেও হরিণ দেখতে পাবি অনেক।

নাঃ, ইচ্ছে করছে না।

গ্রামের মানুষ অরুণাংশুকে না চিনলেও স্কুলের মাস্টারদের মধ্যে তার ভক্ত থাকবেই। শুধু জয়মণিপুরে তিন জন শিক্ষকই নয়, খবর পেয়ে গোসাবার দু'জন শিক্ষক এলেন অরুণাংশুর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। লেখকদের সামাজিক দায়িত্ব, সাহিত্যে অশ্লীলতা, বাংলা সাহিত্যে এখন আর গ্রাম নিয়ে তেমন কিছু লেখা হচ্ছে না কেন। এই সব ভাল ভাল বিষয় নিয়ে বিখ্যাত লেখক অরুণাংশু সেনগুপ্তর সঙ্গে মনোজ্ঞ আলোচনা করার বাসনা নিয়ে এসেছিলেন তারা। কিন্তু অরুণাংশু তাদের জিজ্ঞেস করল, ধানের দর কত, চাষির ছেলেরা লেখাপড়া শিখে কী করে হস্টেলে কী রকম খাওয়া দেয়, হ্যামিল্টন সাহেব আসলে বুর্জোয়া জমিদার ছিল কি না এই সব এলোমেলো প্রশ্ন এবং একটু পরেই শিক্ষকদের নিজের ঘরে বসিয়ে রেখে পরিমলের খাটে গিয়ে শুয়ে রইল। আর এলই না।

মাস্টারমশাইরা কিছুক্ষণ মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বসে থেকে উঠে গেলেন এক সময়।

সৃষ্টিধব বেবাব মিষ্টিপুকুরের খুব ভাল জিওল মাছ আছে, তার থেকে বেশ বড় বড় গোটা কতক মাগুর সে পাঠিয়ে দিল এ বাড়িতে। জ্বর থেকে উঠে মাস্টারমশাই আজ ঝোল-ভাত পথ্য করবেন সেই জন্য। সৃষ্টিধব ধানের কারবার করে বেশ দু পয়সা আছে, তার এক জন দুর্বল প্রতিবেশীকে জোর করে জমি থেকে উৎখাত করবাব চেষ্টা করছে লোকটিকে পছন্দ করে না পরিমল। গ্রামের অন্য লোকজনদের মধ্যে এটা জনমত সৃষ্টি করেও সে সৃষ্টিধবকে শায়েস্তা করতে পারেনি। অনেকেই আড়ালে গিয়ে সৃষ্টিধবের কাছে হাত পাতে। খোঁজ করলে হয়তো দেখাবে গ্রামের বেশির ভাগ লোকই সৃষ্টিধবের কাছে কোনও না কোনও ভাবে ঋণী।

ও মাছ ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল পরিমল। কিন্তু ইলা আগেই কুটে ফেলেছে।

সুলেখা বলল, ঠিক আছে, সৃষ্টিধববাবুকে দাম পাঠিয়ে দিলেই হবে।

তবু মুখখান গোঁজ হয়ে রইল পরিমলের। মাগুর মাছ তার খুবই প্রিয়। এ রকম স্বাস্থ্যবান মাগুর আশেপাশের দশখানা হাট খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। তবু আজ এই মাছে কোনও স্বাদ পেল না পরিমল।

পাশাপাশি দুই বন্ধু খেতে বসেছে। মাগুর মাছ বিষয়ে এত সব কথাবার্তার মধ্যে একটিও মন্তব্য করলেন না অরুণাংশু। একেবারে নিঃশব্দ। আহারে রুচি নেই, খেতে হয় তাই খাওয়া।

তুই মুড়োটা খা। তুই তো মাছের মুড়ো ভালোবাসিস।

অকণাংশু থালায় আঁকিবুকি কাটছে। অর্ধেক পাত পড়ে আছে। এমনিতে সে মাছ খেতে খুবই ভালবাসে, অথচ আজ কোনও আগ্রহই নেই।

সুলেখা স্কুলে চলে যাওয়া মাত্র পরিমল বলল, একটা সিগারেট দে।

অরুণাংশু অন্য মনস্কভাবে নীল রঙের ধোঁয়ার নানা রকম প্যাটার্ন পর্যবেক্ষণ করছে।

তোর কী হয়েছে বল তো? গুরুতর ব্যাপার মনে হচ্ছে।

অরুণাংশু বলল, না, সে-রকম কিছু না। এমনিই মনটা ভাল নেই।

ডিপ্রেশান?

তোর এ-রকম হয় না কখনও?

যারা ভাবের কারবার করে, তাদেরই মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়। আমি এখানে সব সময় একেবারে রূঢ় বাস্তবের মধ্যে থাকি, মানুষের নিছক খাওয়া-পরা জন্ম-মৃত্যু খরা-বন্যা, জমি ধান ঋণ খালকাটা এইসব–এই সব এলিমেন্টাল ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে থাকলে কখনও কখনও রাগ হয়, ক্ষোভ হয়, অস্থিরতা এমনকী হতাশাও আসতে পারে মাঝে মাঝে। কিন্তু যাকে মন খারাপ বলে, তা হবার কোনও সুযোগ নেই।

পরিমল এমন গুরুত্ব দিয়ে বলল কথাগুলো, কিন্তু অরুণাংশু শোনেনি। শূন্য ভাবে চেয়ে আছে, মন অন্য কোথাও।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

এই জায়গাটা অদ্ভুত ঠাণ্ডা। পাখিটাখির ডাক ছাড়া কোনও শব্দ নেই। ট্রাম-বাসের আওয়াজ আর মানুষের চেঁচামেচি শুনতে হচ্ছে না, এ এক দারুণ শান্তি।

পরিমল ভুরু কুঁচকে তাকাল বন্ধুর দিকে। লেখার সময়টুকু ছাড়া যে-মানুষ সব সময় হইচই, মানুষের সঙ্গ, ফুর্তি, আত্মম্ভরিতায় সুড়সুড়ি লাগানো কথাবার্তা ছাড়া থাকতে পারে না, তার হঠাৎ এই নৈঃশব্দ্য-প্রীতি?

অরুণাংশু বলল, তোর এখানে আমি যদি বছর খানেক থেকে যাই? জমি চাষ করব, খাল কাটার জন্য কোদাল ধরব, নৌকো নিয়ে চলে যাব জঙ্গলে।

ব্যাপারটা আসলে কী? বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া? সান্ত্বনাকে নিয়ে আসবি বলেছিলি যে?

না, ব্যাপারটা মোটেই স্ত্রীঘটিত নয়। অরুণাংশু যে-রকম জীবন যাপন করে, তাতে প্রায়ই যে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হবে সে আর এমন কী অস্বাভাবিক ব্যাপার। সান্ত্বনার সহ্যশক্তি খুবই। দু-তিনবার অবশ্য সেই সহ্যশক্তিরও সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় সান্ত্বনা ডিভোর্সের প্রস্তাব দিয়েছে। একটি অখ্যাত ছোট পত্রিকায় লেখা হয়েছে, এক কালের প্রতিভাবান বিদ্রোহী, আধুনিকতার ও যৌবনের প্রধান প্রবক্তা অরুণাংশু সেনগুপ্ত এখন এস্টাব্লিশমেন্টের কাছে বাঁধা পড়ে গেছেন। পয়সার জন্য লেখেন, জনপ্রিয়তার জন্য দুধে জল মেশাচ্ছেন।

এ-সব সমালোচনা গ্রাহ্য করেনা অরুণাংশু। সাহিত্য-জীবনের প্রায় গোড়াতেই সে ধরে নিয়েছিল যে, অক্ষম লোকেরাই সমালোচনা করে। কোনও এক জন লোক বলে দেবে, তোমার লেখাতে এই এই দোষ, অমুক অমুক ত্রুটি, তাতেই কোনও লোক নিজেকে সংশোধন করে নেবে? এ-রকম কখনও হয়?

নিন্দে সে সহ্য করতে পারে না একেবারে। আর নিন্দে বা কটু সমালোচনা তো হবেই। কেউ সার্থক হলেই একদল লোক তাকে ছোট করবার চেষ্টা করে। বামনদের দেশে দু-এক জন যদি লম্বা হয় অমনি অনেকে তাদের টেনে হিচড়ে নিজেদের সমান করতে চেষ্টা করে। নির্লজ্জ ঈর্ষা নানা রকম রঙিন ভাষার পোশাক পরে সমালোচনার নামে আসরে নামে। আর সব যুগেই থাকে একদল নপুংসক ধরনের লোক, যারা নারী-পুরুষের শারীরিক মিলনের কোনও বর্ণনা দেখলেই সমাজ-সংস্কৃতি সব গেল গেল বলে আর্তনাদ করতে থাকে। অরুণাংশু এ-সব পত্র-পত্রিকা পেলেই ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় একদিন একটি যুবক একটি পত্রিকা বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, অরুণদা এটা একটু পড়বেন। অরুণাংশু আগেই জানত সে-পত্রিকায় তার সম্পর্কে কী লেখা হয়েছে। সেঝট করে পত্রিকাটি সেই যুবকটির মুখে চেপে ধরে বলেছিল, নে, খা তোর বমি তুই নিজেই খা।

তবু কোনও এক সময় ভেতরের কোনও একটা জায়গায় হঠাৎ লাগে। কিছু একটা ঝন করে বেজে ওঠে। অক্ষম ব্যর্থদের ঈর্ষার জন্য নয়, এমনিই এক-একসময় নিজের গভীরে গিয়ে নিজেকে দেখতে ইচ্ছে হয়। আপাত-সার্থকতার ওপর পড়ে ব্যর্থতার গোপন গভীর ছায়া। পত্রিকাটা উপলক্ষ মাত্র।

অরুণাংশু উদাসীন ভাবে বলতে লাগল, জীবনটা কী ভেবেছিলাম, কী হয়ে গেল! ভেবেছিলাম জীবনে কোনও বন্ধন থাকবে না, অথচ এই যে লেখালেখি, এ-ও তো বন্ধন, বছরে দুটো-তিনটে উপন্যাস লেখা, ইচ্ছে না থাকলেও অনেক সময় লিখতে হয়। ট্র্যাজেডি কিজানিস, যারা এস্টাব্লিশমেন্টের বাইরে থাকে, তাদের আসলে মনে মনে ইচ্ছে করে ওর মধ্যে ঢুকব, কবে বড় কাগজে সুযোগ পাব, তাদের গালাগালি হচ্ছে কংস রূপে ভজনা, আর যারা এস্টাব্লিশমেন্টের মধ্যে ঢুকে যায় তাদের মধ্যেও একটা অস্থির ছটফটানি থাকে, তারাও ভাবে, বন্দি হয়ে গেলুম? এর থেকে বেরুতে পারব না? ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক, সারা জীবন অনবরত লিখেই যেতে হবে? যে-ভাষার জন্য এত মায়া ছিল, সেই ভাষাও ক্ষয়ে যায়, ঠিক আয়ুর মতো।

এটাই তো স্বাভাবিক।

কী স্বাভাবিক?

যদি আয়ুর টার্মসে ভাবিস!

ঠিক বলে বোঝাতে পারব না, এক ধরনের কষ্ট...মনে হয়, এ পর্যন্ত যা কিছু করেছি সবই ব্যর্থ।

একটু একটু ঘুম এসে যাচ্ছে পরিমলের। কিন্তু সে ঘুমোবে না। জ্বরের পর ভাত-ঘুম ভাল নয়। সে অরুণাংশুর আত্মগ্লানির প্রশ্রয় দিতে লাগল। অরুণাংশুও এ-সব কথা কোনও দিনই মুখে বলে না, আজ বলছে যখন বলুক। মন থেকে বেরিয়ে যাক, সেটাই ভাল হবে।

ছেলে-মেয়েদের পড়বার ঘরে খাটে কাত হয়ে শুয়ে আছে অরুণাংশু, সে বসে আছে চেয়ারে। এর মধ্যে তিনটে সিগারেট খাওয়া হয়েছে খুবই দোনা-মোনা ভাবে। জানলা দিয়ে দেখতে পেল বাগানের গেট খুলে ভেতরে ঢুকছে সাধুচরণ।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সাধুচরণ ঠিক চোরের মতো মুখের ভাব করে বলল, নমস্কার মাস্টারমশাই। অন্য চেয়ারটি ঠেলে দিয়ে পরিমল গম্ভীর গলায় বলল, বসো।

বসল না, চেয়ারের পেছন দিকটা ধরে দাঁড়িয়েই রইল সাধুচরণ। কথার মাঝখানে অন্য একটি লোকে এসে পড়ায় অরুণাংশু বিরক্ত হয়েছে।

পরিমল বলল, এর নাম সাধুচরণ পণ্ডা। এর স্বাস্থ্যটি দেখেছিস?

অরুণাংশু বলল, এ-দিককার লোকের স্বাস্থ্য তেমন খারাপ নয়। আমি পুরুলিয়া বাঁকুড়া গিয়ে দেখেছি গ্রামের মানুষ সবারই যেন রোগাটে ক্ষয়টে চেহারা।

সত্যেন দত্ত যে-বাঙালিদের কথা লিখেছেন, এখানকার লোকদের সম্পর্কেই তা বেশি বেশি করে খাটে। এদের সত্যিই বাঘ কুমির আর সাপের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচতে হয়।

কুমির কোথায় এখন? কুমির আর বিশেষ নেই।

কুমিরের জায়গা নিয়েছে দারিদ্র্য। আগে এ-দিকে এত দারিদ্র ছিল না। এই যে এর এক বন্ধুকেই তো ক'দিন আগে বাঘে নিয়ে গেছে।

সাধুচরণ এক মনে নিজের পায়ের নখ দেখছে।

বসো সাধু। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

আপনি আমাকে ডেকেছিলেন মাস্টারমশাই?

মনোরঞ্জনকে কী করে বাঘে ধরল, আমাকে বুঝিয়ে দাও তো? সত্যি করে বলো। কোন জঙ্গলে কাঠ কাঠতে গিয়েছিলে তোমরা?

এই জন্যই তো সাধুচরণ আসতে চায় না মাস্টারমশাইয়ের কাছে। সবাই জানে মিথ্যে কথা বলার সময় সাধুচরণের চোখের পাতা কাঁপে না। কিন্তু এই মানুষটির কাছে এলেই তার কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। কিন্তু এই ব্যাপারে চোখের পাতা কাঁপালে কিছুতেই চলবে না। আকবর মণ্ডলের কাছ থেকে পারমিট সে জোগাড় করেছিল নিজের দায়িত্বে। সাত নম্বর ব্লকের কথা জানাজানি হলে আকবর মণ্ডল বিপদের পড়বে, তখন সে সাধুচরণকেও ছাড়বে না।

কথাটা ঘুরিয়ে সে উত্তর দিল, ফরেস্টের বড়বাবুকে সেখানে নিয়ে গিসলাম, তিনি নিজের চোখে দেখে রিপোর্ট দিয়েছেন।

কী হয়েছিল, গোড়া থেকে আমাকে বলো তো!

একটু থেমে থেমে, সাহিত্যিকদের চেয়েও সতর্কভাবে শব্দ নির্বাচন করে সাধুচরণ পুরো ঘটনাটির বিবরণ দিল আবার। তারপর সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কোনও জায়গায় ভুল করেনি।

পরিমলের সঙ্গে অরুণাংশুও আংশিক মনোযোগ দিয়ে ঘটনাটা শুনল। বাঘের গল্পে খানিকটা রোমাঞ্চ থাকেই, শুনতে শুনতে মনের মধ্যেকার শিশুটি জেগে ওঠে।

অরুণাংশুর দিকে তাকিয়ে পরিমল বলল, এর গল্পের কতখানি মিথ্যে বল তো? ঠিক পঞ্চাশ ভাগ!

সাধুচরণ চমকে মুখ তুলতেই পরিমল বলল, তোমরা যে কোর-এরিয়ার মধ্যে গিয়েছিলে, তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তবে ওই সত্যি কথাটা আর কারুর কাছে বোলো না।

আমার কাছে যে-ভাবে মিথ্যে গল্পটি চালালে, অন্যদের কাছেও ঠিক সেইভাবেই বলবে। দলের লোকদেরও বলে রাখবে, যেন ফাঁস করে না দেয়।

এতক্ষণ বাদে সত্যিকারের আশ্বস্ত হল সাধুচরণ।

মনোরঞ্জন খাঁড়া...ছেলেটিকে দেখেছি আমি নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ। মাস্টারমশাই, আপনি অনেকবার দেখেছেন। কো-অপ থেকে জিনিসপত্তর ধার নেবার জন্য ওই তো আপনার কাছে হাঁটাহাঁটি করেছিল।

ও হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো। আমি ওকে ভাল রকম চিনি। জ্বরের জন্য মাথাটা গোলমাল হয়ে গেছে, বেশ তেজি ছিল ছেলেটা।

ও এমন ভাবে চলে গেল...এটা ভগবানের অন্যায়..বাড়িতে নতুন বিয়ে করা বউ...।

পরিমল সস্নেহে তার বাহু ছুঁয়ে বলল, এই লোকটি গত বছর ধান কাটার সময় একটি জমিতে লাঠি হাতে নেমেছিল। নিজের জমি নয়, এক গরিব চাষির জমি, ও সাহায্য করতে গিয়েছিল নিঃস্বার্থ ভাবে। সেজন্য জেল গেছে। জেল থেকে ফেরার পর আমি বলেছিলাম ওকে একটা কাজ দেব। আমাদের স্কুলে এক জন দফতরি লাগবে। কিন্তু গভর্নিং কমিটির মিটিং না হলে তো–।

অরুণাংশু বলল, এ-রকম একটা লোক ইস্কুলের দফতরি হবে, দ্যাটস এ পিটি।

তাহলে ওর দ্বারা আর কী করা সম্ভব? ওর নিজস্ব জমিও বিশেষ নেই।

অন্য দেশ হলে এ-রকম ভাল চেহারার মানুষ কুস্তিগির কিংবা বক্সার হত। ট্রেনিং পেলে খেলা থেকেও কত টাকা রোজগার করা যায়।

ও-সব আকাশকুসুম। এই সব ভূমিহীন লোকেরা সারা বছরই থাকে দৈনিক জন খাটার আশায়। বছরে কয়েক মাস কোনও কাজই পায় না। প্রত্যেক দিনের খাদ্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত

হলে তারপর এদের অন্য কাজে লাগানো যায়। সেই জন্যই ভেবেছিলুম ইস্কুলের দফতরির চাকরিটা দিয়ে ওকে কো অপারেটিভের কাজে মাতিয়ে তুলব। কিন্তু আমি জানি, চাকরিটা দিলেও ও রাখতে পারবে না, দু-এক মাস বাদে পালিয়ে যাবে।

না, কাজ ছাড়ব কেন মাস্টারমশাই!

হ্যাঁ ছাড়বে আমি জানি। বুঝলি অরুণাংশু, এটাই ওদের নেশা। এই নদী, এই জঙ্গল এদের টানে, সেই জন্য বার বার এরা বিপদের মুখে যায়। এখন জঙ্গলে কাঠ কাটতে যাবার কোনও দরকার ছিল না, আর দুমাস অপেক্ষা করলেই ও চাকরি পেত, কিন্তু ও নিজেই অন্য ছেলেগুলোকে তাতিয়ে বাঘের মুখে নিয়ে গেছে। কী সাধু, অস্বীকার করতে পারবে?

সাধুচরণের মুখে একটা অদ্ভুত ফ্যাকাসে ধরনের হাসি ফুটে উঠল। এবার সে মাস্টারমশাইয়ের কাছে সত্যি কথা বলবে। যত গরিবই হোক, তবু প্রত্যেক মানুষের ভেতরে খুব একটা অহঙ্কার আছে। নিজের অভাবের কথা অন্যকে জানাতে চায় না, যখন জানাতে বাধ্য হয়, তখন ওই রকম হাসি লেগে থাকে সেই মানুষের ঠোঁটে।

মাস্টারমশাই, কিছুতেই আমার খিদে মেটে না, রোজ যা খাই সব সময় তবু পেটে খিদে খিদে থাকে! আমি একটু বেশি ভাত খাই, কিন্তু অত ভাত দেবে কে? কার্তিক-অঘ্রাণ মাস থেকেই বুঝলেন মাস্টারমশাই, আপনি তো জানেন, ভাতে টান পড়ে যায়, বউটা তো কম খেয়েই থাকে, ছেলে-মেয়ে দুটো ঘ্যান ঘ্যান করে, তাদের না দিয়ে আমি নিজে খাই কী করে? বর্ষা নামল না। জমির কাজ নেই, আর দুটো মাস বসে থাকা...। তাই ভাবলুম, জঙ্গলে যদি একটা খেপ মেরে আসি।

কথা বলতে বলতে মাঝখানে থেকে সে উদাস হয়ে যায়। ঠিকমতো ভাষা খুঁজে পায় না। হঠাৎ সে পিতা হয়ে গিয়ে নিজের ছেলে মেয়েদের কথা ভাবে।

পরিমল আবিষ্ট ভাবে তাকাল অরুণাংশুর দিকে। ভাবখানা এই, শুনছিস তো। একটু আগে তোর নিজের দুঃখের কথা বলছিলি, এই দেখ, সত্যিকারের দুঃখ কাকে বলে!

মাস্টারমশাই, আমাকে যদি বাঘে ধরত, তাতেও আমার কোনও দুঃখ ছিল না, খিদে সহ্য করার চেয়ে...। কিন্তু মনোরঞ্জন, ওকে আমরা সঙ্গে নিতে চাইনি, নিয়তি ওকে টেনেছে। তবে ওরও ঘরে ভাতের টান পড়েছিল।

যাকগে, মনোরঞ্জন গেছে...। এখন তার বাড়ির কী অবস্থা?

ওই যেমন হয়। আপনাকে তার বেশি কী বলব, আপনি তো সবই জানেন...।

মনোরঞ্জনের স্ত্রী চলে গেল, তাকে তোমরা আটকাতে পারলে না? এখনও শান্তি-স্বস্ত্যয়ন হল না।

সাধুচরণ চমকে উঠে বলল, সে আপনার এখানে নেই?

ছিল তো, তারপর তার বাবা-কাকা এসে নিয়ে গেল জোর করে।

নিয়ে গেল? আপনি যেতে দিলেন?

আমার তো তখন অসুখ...। তা তার বাবা-কাকা নিতে চাইলে আমরা আটকাবার কে? তোমাদের গ্রামের বউ, স্বামী মরতে না মরতেই...।

কী করব, মনার মা যে বড় চেঁচামেচি শুরু করল। এমন করতে লাগল যে বাড়িতে কাক-চিল পর্যন্ত তিষ্ঠোতে পারে না।

ঠিক আছে, আমার পায়ে একটু জোর আসুক, তারপর আমি গিয়ে এমন ওষুধ দেব যে, দেখবে তক্ষুনি মনোরঞ্জনের মায়ের চেঁচানি বন্ধ হয়ে যাবে।

সাধুচরণ এতক্ষণ বাদে খেয়াল করল যে, কয়েক দিনের অসুখেই পরিমল মাস্টার বেশ রোগা হয়ে গেছেন। দাড়িও কামাননি।

ও শুয়োরের বাচ্চারা কী বোঝে?

সাধুচরণ এবং পরিমল দুজনেই চমকে তাকাল অরুণাংশুর দিকে। ওঁদের দুজনের কথার মাঝখানে অরুণাংশুর এই চিৎকার এমনই অপ্রাসঙ্গিক যে ওঁরা বিমূঢ় হয়ে যায়। অরুণাংশু তাকিয়ে আছেন দেয়ালের দিকে। ওঁরা কী করে বুঝবে যে অরুণাংশুর এই হুঙ্কার তার অনুপস্থিত সমালোচকদের উদ্দেশে।

অরুণাংশু উঠে বসে আবার বলল, ওরা কি জানে, এখনও আমি কত কষ্ট করি! এক-একটা লেখার জন্য দিনের পর দিন ছটফট করতে হয়, আমি কাঁদি, আমার মনগড়া চরিত্রগুলোর জন্য আমার যে কী সাংঘাতিক অবস্থা হয়। লোকেরা অন্য কথা বলে, আমার মাথায় কিছু ঢোকেনা। কেউ বুঝবে না, আমার কষ্ট কেউ বুঝবে না।

সাধুচরণ হাঁ করে অরুণাংশুর কথা শুনছে, কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না তার।

অরুণাংশুর বৈরাগ্য তিন দিন স্থায়ী হল। মাঠে হাল ধরা কিংবা খাল কাটার জন্য কোদাল ধরার সম্পর্কে চিন্তা ত্যাগ করে সে আবার শহরের কাছে আত্মসমর্পণ করবার জন্য ছুটল। ফেরার পথে গোসাবায় এক পরিচিত এসডিপিও-র সঙ্গে দেখা। ইনি পুলিশ হলেও সাহিত্য-রসিক, অরুণাংশুর এক বন্ধুর বন্ধু, সেই সুবাদে অরুণাংশুকে খাতির করে তুলে নিলেন নিজের লঞ্চে।

তারপর চলল খানাপিনা। আবার সারা দিন ধরে নেশা, লোকজনকে ধমক ও গান। আত্মবিস্মৃতির যতগুলি উপায় আছে কোনওটাইঅরুণাংশু বাদ দিল না। ক্যানিং এনা গিয়ে ফের চলে গেল নামখানায়। সেখান থেকে রায়দিঘি। সেখানেও এক পরিচিত সরকারি অফিসার থাকেন, তার কোয়ার্টারে কাটল দুদিন।

কলকাতায় ফিরে, এই কয়েকদিনে যা টাকা-পয়সা খরচ হয়েছে সেটা তোলবার জন্য সে খবরের কাগজের জন্য একটা লেখা তৈরি করে ফেলল চটপট।

খবরের কাগজে একটা যা হোক কিছু লিখলেই তাকে শ'দুয়েক টাকা দেয়। সব সময়ই অরুণাংশুর আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। যত খরচ বাড়ে, ততই বেশি লিখতে হয় রোজগারের জন্য। বেশি লিখতে লিখতে ধরে যায় বিরক্তি। তখন সেই বিরক্তি কাটাবার জন্য বাইরে যাওয়া, তার জন্য আবার খরচ।

কী লিখি, কী লিখি, ভেবে অল্পক্ষণ মাথা চুলকোতেই একটি চমৎকার বিষয়বস্তু মনে পড়ে গেল। বাঘের মুখে নিহত এক ব্যক্তির সদ্য বিধবা পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। পুরো লেখাটির জন্য রইল সত্য ঘটনার উত্তাপ।

বাসনার সঙ্গে অরুণাংশু একটি কথাও বলেননি। এমনকী চোখের দেখাও হয়নি। তবু এই কাল্পনিক সাক্ষাৎকারটি এমনই মর্মস্পর্শী হল যে পাঠক-পাঠিকার চিঠি এল ষাট-সত্তরটা। কয়েক জন সরকারি অফিসার সেই লেখাটি এক জন মন্ত্রীর নজরে আনলেন। মন্ত্রীর তো পড়বার সময় নেই। বিষয়বস্তুটি জেনে নিলেন এবং নির্দেশ দিলেন একটি ফাইল খোলার জন্য। নাজনেখালির মনোরঞ্জন খাঁড়া মহাকরণের নথিপত্রে অমর হল।

সেই মানুষটির উত্তাপ

এইখানে এসে প্রথম বসেছিল মনোরঞ্জন এই জলচৌকিতে, মেঝেতে ছিল আলপনা আঁকা। জামাই আসবে বলে এই ঘরখানাই বানানো হয়েছিল নতুন, সব কিছুতেই নতুন নতুন গন্ধ।

জলচৌকিটা নেই, ঠিক সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে বাসনা। ঘোর দুপুর। থান কাপড় পরা বাসনার মুখখানিতে স্বপ্ন মাখা। ঘরে এখন আর কেউ নেই, বাসনা অনেকক্ষণ ধরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সম্পূর্ণ চুপচাপ। কিন্তু তাকে দেবী-প্রতিমার মতো দেখাচ্ছে একথা বলা যাবে না। কারণ বাসনা সে-রকম একটা কিছু দেখতে ভাল নয়। নাকটা বোঁচার দিকেই, মুখখানা গোলগাল, আর এক ইঞ্চি লম্বা হলেই ওকে বেঁটে বলা যেত না। তবু এই বাইশ বছর বয়েসে বাসনা কোনও দিন এমন স্তব্ধ, স্থির ভাবে এতক্ষণ কোথাও দাঁড়িয়ে থাকেনি, সেই জন্য তাকে একটু অন্য রকম দেখাচ্ছে ঠিকই।

তোমার ডাকনাম বাসি, তাইনা?

মোটেইনা।

কেন লুকোচ্ছ? বাসনার ডাকনাম বাসি হবে না তো কী? ঠিক বাসি-বাসি চেহারা।

আমার কোনও ডাক নামই নেই!

বুঝেছি। কলাগাছের বাসনা হয় জানো তো? তোমাকে নিশ্চয় বাপের বাড়ির সবাই বাস্না বলে ডাকে। নামখানা কী মানিয়েছে, একেবারে সাক্ষাৎ কলাগাছ।

আর তোমার নামখানাই কী?

আমার মতো এমন ভাল নাম হোল টুয়েন্টি ফোর পরগনাজ-এ আর কারুর আছে? খুঁজে বার করো তো আর একটা মনোরঞ্জন?

আর খাঁড়া? শুনলেই ভয় করে।

ভয় তো করবেই। আমাদের কী যে-সে বংশ?

তোমাদের বংশের আগেকার লোকেরা ডাকাত ছিল, তাই না?

ডাকাত? আমার ঠাকুরদার বাবা ছিল কর্ণগড়েব রাজার সেনাপতি। মিদনাপুরে এখনও আছে কর্ণগড। বীরের যা যোগ্য কাজ, লহ খড়গ, বধো এই বিশ্বাসঘাতকে' পতিঘাতিনী সতী পালা দেখোনি? সেই খড়গ থেকে খাঁড়া।

হি-হি হি-হি, সেনাপতি? ঢাল-তরোয়াল কোথায়?

আমার ঠাকুরদা মিদনাপুর থেকে চলে এসেছিল এই বাদায়। অনেক জমি-জায়গা ছিল আমাদের। নদীতে সব খেয়ে গেছে।

আমরাও মেদিনীপুর থেকে এসছি।

জানি! চুরি করে পালিয়ে এসছিলে। তাই তোমাদের পদবি সাধু।

এই, এই ভাল হবে না বলছি।

তোমার কাকাটাকে তো একদম চোরের মতো দেখতে।

এই হচ্ছে মনোরঞ্জন-বাসনার মধুযামিনীর নিভৃত সংলাপের অংশ। প্রতিটি শব্দ মনে আছে বাসনার। লোকটা খুব রাগাতে ভালবাসত। আর যাত্রাপালার কত কথা যে মুখস্থ বলতে পারত পটাপট।

বিয়ের পর মাত্র একবারই সস্ত্রীক শ্বশুর বাড়িতে এসেছিল মনোরঞ্জন। তিনটি রাত কাটিয়ে গেছে এই ঘরে। শ্বশুর-জামাই সম্পর্ক প্রথম থেকেই একটু চিড়্ধরা ছিল। মনোরঞ্জনের ধারণা তাকে যথেষ্ট খাতির করা হয় না। সে বেলে মাছ খায় না জেনেও তাকে বেলে মাছের ঝোল খেতে দেওয়া হয়েছিল। বেলে, গুলে, ন্যাদোস –এই সব কাদা খাওয়া মাছ মনোরঞ্জন পছন্দ করে না। বাসনা তো জানত, সে কেন তার বাপ-মাকে বলে দেয়নি? এরা সবাই মাছের দেশের লোক, নতুন জামাইকে খাসির মাংস খাওয়াতে পারেনি এক দিন?

ব্যাপারটা হচ্ছে এই মনোরঞ্জনদের তুলনায় বাসনার বাবা-কাকার অবস্থা কিছুটা ভাল। শ্রীনাথের বারো বিঘে খাস জমি। তাছাড়া কিছু খুচরো ব্যবসাপত্তর আছে। নাজনেখালির তুলনায় মামুদপুর অনেকবর্ধিষ্ণু জায়গা। কিছু দোকানপাট আছে, দিনে দু'বার লঞ্চ আসে, তাছাড়া আসে ব্যাঙ্কের লঞ্চ। সুতরাং মনোরঞ্জনের মতো গোঁয়ারগোবিন্দ এবং গরিব পাত্রের তুলনায় আরও কিছুটা অবস্থাপন্ন ঘরের ভাল ছেলের সঙ্গে বাসনার বিয়ে হতে পারত। কিন্তু ওই যে বলে না, কপালের লেখা।

বাসনার বিয়ে দিতে হল তো খুব তাড়াহুড়ো করে। শ্রীনাথ সাধুর বরাবরের গোঁ, মেদিনীপুরের লোক ছাড়া অন্য কোনও ঘরে মেয়ে দেবে না। এদিকে ফটিক নামে এক বাঙাল ছোঁড়া বাসনার পেছনে লাগল। সে-ছোঁড়াটা একেবারে হাড় হারামজাদা। এমন ভাল মেয়ে বাসনা, তার কানে ওই ফটিক এমনই ফুসমন্তর দিয়েছিল যে তাতেই বাসনার মাথা খারাপ হয়ে গেল। ওই ফটকের সঙ্গে বাসনা রওনা দিয়েছিল হাসনাবাদের দিকে, ভাগ্যিস পথেই নিতাইচাঁদের হাতে ধরা পড়ে যায়! ন্যাজাটের লঞ্চঘাটায় নিতাইচাঁদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক মহাজনের সঙ্গে হিসাব-পত্তর কষছিল, হঠাৎ চোখ তুলে দেখল, লঞ্চের খোলে বসে আছে বাসনা। প্রথমে নিতাইচাঁদ নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারেনি। বোকা-বোকা লাজুক মেয়ে বাসনা, কোনও দিন একলা বাড়ির বাইরে পা দেয়নি, সে কিনা লঞ্চে! সঙ্গে কে আছে? তক্তা তুলে নিয়ে লঞ্চ তখন সবেমাত্র জেটি ছেড়েছে, নিতাইচাঁদ চেঁচিয়ে উঠেছিল, ওরে থামা, থামা! ও সারেং ভাই, লঞ্চ ভিড়োন আবার!

বাড়িতে এনে বাসনাকে আগা-পাশ-তলা পেটানো হয়েছিল, তার মুখ থেকে জানাও গিয়েছিল ফুসলাইকারির নাম। কিন্তু ফটিককে তো কিছু বলা যায় না, তা হলেই সব জানাজানি হয়ে যাবে যে! তখন সাত-তাড়াতাড়ি করে মেয়ের বিয়ে না দিলে চলে না! মেদিনীপুরের ভাল ছেলে ঠিক তক্ষুনি আর পাওয়া গেল না। শ্রীনাথের শালা ওই নাজনেখালির মনোরঞ্জনের সন্ধান আনল, আর হুট করে বিয়ে হয়ে গেল।

বাসনার মা সুপ্রভা বলেছিল, তা যাই বলল, জামাই আমার খারাপ হয়নি। চেহারা-গতর ভাল, বুদ্ধি আছে, গায়ে খেটে এক দিন উন্নতি করবে ঠিকই। শ্রীনাথ বিয়ের দিনই জামাইকে আভাস দিয়েছিল, সে যদি নাজনেখালি ছেড়ে মামুদপুরে এসে থাকতে চায়, তাহলে এখানে তার জন্য বিঘে পাঁচেক জমির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাইতেই মনোরঞ্জন চটে আগুন! সে বছরের অর্ধেক সময় অপরের জমিতে জন খাটে বটে, কিন্তু সে কিছুটা লেখাপড়া শিখেছে, যাত্রা নাটকে সে কত বীরপুরুষ আর আদর্শবান ব্যক্তির কাহিনি জানে, সে হবে ঘরজামাই?

সেই জন্যই তো মনোরঞ্জন বাসনার কাছে প্রতি কথায় একবার করে শ্বশুর বাড়িকে ঠোকে।

তুমি কলকাতা দেখেছ?

না।

গোসাবা?

ও মা, গোসাবা দেখব না কেন? একবার ক্যানিং পর্যন্ত গেসলাম, কলকাতা যাব বলে, ও হরি, সেখানে দেখি রেলগাড়ি চলছে না, রেলগাড়ির হরতাল! ব্যাস, আর যাওয়া হল না।

সে তো অনেক দিন আগে ট্রেনের হরতাল হয়েছিল। তারপর আর যেতে পারোনি?

না যাইনি। কে নিয়ে যাবে?

তোমার বাপ-মা একেবারে চাষাভুষো ক্লাস। মেয়েকে একবারও কলকাতা দেখিয়ে আনতে পারেনি পর্যন্ত। তোমাদের বাড়ির কেউই নিশ্চয়ই কখনও কলকাতা যায়নি?

আমার কাকা প্রত্যেক মাসে একবার কলকাতায় যায়।

চোরাই মাল বেচতে, তা জানি!

এই, আবার সেই এক কথা?

তোমার কাকার চেহারা অবিকল চোরের মতো নয়!

মোটেই নয়।

তোমার বড়দিদির যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, সে খেয়ার নৌকো চালায় না?

বড় জামাইবাবু? উনি তো ইস্কুলের মাস্টার।

হেঃ! খলসেখালিতে ইস্কুলই নেই, তার আবার মাস্টার! আমি খলসেখালিতে যাইনি ভেবেছ?

ইস্কুল তো পাশের গ্রামে! জামাইবাবু রোজ হেঁটে যাওয়া-আসা করেন।

তাহলে তোমার জামাইবাবুর ছেলে ওখানে নৌকো চালায়।

তা চালাতে পারে। তাতে দোষের কী হয়েছে?

না, এক দিন দেখছিলাম কিনা, ছেলেটা মার খাচ্ছে। ইজারাদারের কাছে পয়সা জমা দেয়নি। চুরি করেছিল। চোরের বংশ। কালো হ্যাংলাপানা একটা ছেলে আছে না তোমার দিদির? খুব পিটুনি খেয়েছে।

সে মার খাচ্ছিল, তা-ও তুমি থামাতে যাওনি?

তখন কি জানি ওই ছেলের মাসির সঙ্গে আমার বিয়ে হবে? শুধু শুধু একটা চোরকে আমি বাঁচাতে যাব কেন?

এ কী অদ্ভুত মানুষ রে বাবা!

হ্যাঁ, আমি দস্তুর মতো অদ্ভুত। সমুখেতে দেখিতেছি অদ্ভুত এক। নিরাকার নহে, উজ্জ্বল বসনে...

এই, একটা কথা বলব?

কী?

আমাকে একবার কলকাতায় নিয়ে যাবে?

খুব শখ না?

বলো না, নিয়ে যাবে কি না?

আচ্ছা নিয়ে যাব। তোমার বাপ তোমাকে কলকাতা দেখায়নি, আমি দেখাব। শেয়ালদায় আমার এক বন্ধু থাকে, কলকাতা আমার সব চেনা।

জামাই বলে তো আর কোঁচা দুলিয়ে, চুলে টেরি কেটে ফুলবাবুটি হয়ে বসে থাকবে না। চাষির ছেলে মনোরঞ্জনের ও-সব শখও নেই। হ্যাঁ, প্রথম বউ নিয়ে আসবার সময় সে মালকোচা মারা ধুতির ওপর নীল রঙের শার্ট পরে এসেছিল বটে, পায়ে রবারের কাবলি, কিন্তু আসা ইস্তক সে জুতো ও শার্ট খুলে রেখেছিল। মামুদপুরে ভাল বীজ ধান পাওয়া যায় সে শুনেছিল, একবার হাটখোলার দোকানগুলোয় খোঁজ নিয়ে এল। ফিরে এসে দেখল ডাব পাড়ার তোড়জোড় চলছে। এটাই তার জন্য এস্পেশাল খাতির।

শ্রীনাথ আর নিতাইচাঁদ বাড়ি ভাগাভাগি করে নিয়েছে। শ্রীনাথের পাঁচ ছেলে মেয়ের মধ্যে বাড়িতে আছে দুই ছেলে। বড়টি বিবাহিত, ছোটটির বয়স বছর চোদ্দো। শ্রীনাথ একটু দুর্বল স্বভাবের বলে নিতাইচাঁদই এখনও সর্দারি করে এ সংসারে।

দু'বাড়ি মাঝখানে ডাব গাছ, কিন্তু দু'বাড়িতে এক জনও লোক নেই ডাব পাড়ার। বাসনার ভাইটা কোনও কম্মের না। এ বাড়ির বাঁধা মুনিষ কালাচাঁদকে খবর পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু সে গেছে জমিতে। লালমোহন বলে আর এক জন আছে ডাব পাড়ায় ওস্তাদ, তাকে ডাকতে গিয়েও ফিরে এল বাসনার ভাই। লালমোহনের কোমরে ব্যথা।

ওই সব দেখেশুনে আর থাকতে পারেনি মনোরঞ্জন। এই লোকগুলো কী? বাড়িতে গাছ পুঁতেছে, আর ডাব পেড়ে দেবে অন্য লোক এসে? বাসনার কাকা নিতাইচাঁদ শুধু বাজখাই গলায় চ্যাঁচাতেই পারে। কাটারিখানা বাসনার ভাইয়ের হাত থেকে নিয়ে সে বলল, দেখি, আমি উঠছি!

বাসনার ভাই বলল, দাঁড়ান, দড়ি আনি। পায়ে দড়ি বাঁধবেন না?

মনোরঞ্জন সগর্বে উত্তর দিয়েছিল, আমার দড়ি লাগে না। এই তো বেঁটে বেঁটে গাছ এ-দিককার।

এই নতুন ঘরের দরজার সামনে বাসনাদাঁড়িয়েছিল সেদিন। খুব গর্ব হয়েছিল তার। তার স্বামীর যেমন গায়ের জোর, তেমনি সাহস, কী সুন্দর তরতরিয়ে উঠে গেল নারকোল গাছে। যেন চোখেব নিমেষে! তারপর কোমর থেকে কাটারিখানা হাতে নিয়ে ঝকঝকে হাসি মুখে সে একবার তাকিয়েছিল বাসনারদিকে।

দরজার সামনে এসে বাসনা নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে নারকোল গাছটার দিকে। গাছটা ঠিক একই রকম আছে। সবই ঠিকঠাক আছে আগের মতো, শুধু এক জন নেই। অথচ ছবিটা সে স্পষ্ট দেখতে পায়।

নিচ থেকে হা-হা করে উঠেছিল নিতাইচাঁদ। অতগুলোর দরকার নেই, অতগুলো লাগবে না, গোটা চারেক।

ততক্ষণে পুরো কাঁদিটাই কেটে ফেলেছিল মনোরঞ্জন। ধপ করে সেটা পড়ল নিচে। নতুন জামাই গাছ থেকে নেমে এসে ভৎর্সনার দৃষ্টিতে তাকাল খুড় শ্বশুরের দিকে। আশ্চর্য এ-দিককার লোকজন। ডাব আর নারকোলের তফাত চেনে না? এগুলো যে পেকে ঝুনো হয়ে গেছে প্রায়, আর কত দিন গাছে থাকবে?

ডাব হলে খেত, কিন্তু নারকোলের জল বা শুধু নারকোল কোনওটাই সে খাবে না বলে খুব একটা ফাঁট দেখিয়েছিল মনোরঞ্জন। এ বাড়িতে সে সব সময় মাথা উঁচু করে থেকেছে।

আর তাস খেলা? মামুদপুরের লোকেরা বিখ্যাত তাসুড়ে, এখানে টুয়েন্টি নাইন খেলার টুর্নামেন্ট হয় পর্যন্ত। বাসনার দাদা বদ্যিনাথ তার বন্ধু বঙ্কাকে পার্টনার নিয়ে সেই টুর্নামেন্ট জিতেছিল একবার। প্রত্যেক সন্ধেবেলা বদ্যিনাথের তাস খেলা চাই-ই চাই। এই উঠোনে মাদুর পেতে হ্যারিকেন নিয়ে বসেছিল তাসের আসর। মনোরঞ্জনও এক পাশে বসে গলা বাড়িয়েছে। নতুন জামাই এসেছে বাড়িতে, তাকে খেলায় না নিলে ভাল দেখায় না। কিন্তু মনে মনে একটা অবজ্ঞার ভাব ছিল বদ্যিনাথের, ওবা জঙ্গলের জায়গার লোক, ওরা তাস খেলার কী জানে!

বদ্যিনাথ ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করছিল, কী হে জামাই, খেলবে নাকি এক হাত!

মনোরঞ্জনও দিয়েছিল তেমন উত্তর।

আমরা ব্রিজ খেলি। এ-সব টোয়েন্টি নাইন তো মেয়েদের খেলা। অনেক দিন অভ্যোস নেই, আচ্ছা দেখি তবু।

তারপর তো মনোরঞ্জন বসল তাস খেলতে। রান্নাঘর থেকে আসা-যাওয়ার পথে বাসনা ফিরে ফিরে তাকিয়ে যায় স্বামীর দিকে। দেখে দেখে আশ মেটে না। এই যে পাঁচ-ছ'জন পুরুষ মানুষ বসে আছে, তার মধ্যে মনোরঞ্জনের মাথাটাই যেন এক বিঘত উঁচু, চুলের ছাঁট কত সুন্দর!

বাপ রে বাপ, এ কী ডাকাতে খেলোয়াড়। পেয়ার না পেয়েও মনোরঞ্জন তেইশ পর্যন্ত ডেকে রঙ করে। প্রথম গোলামেই তুরুপ? সেভেনথ কার্ডেরঙ করেও সে খেলা জিতে যায়? ডবল দিলেইরি ডবল দেয়। একবার খেলল সিঙ্গিল হ্যান্ড। পর পর কালো সেট খাওয়াতে লাগল অপনেন্টদের।

শেষ পর্যন্ত খেলোয়াড়দের এক জন, ছোট পাঁচু স্বীকার করল, দাদা, আপনি বললেন টোয়েন্টি নাইন খেলা অব্যেস নেই, তাতেই এই খেলা? অব্যেস থাকলে না জানি কী হত!

অবশ্য সেই খেলার আসরে একটা খুব মজার ব্যাপারও হয়েছিল।

তাস খেলায় গভীর মনোযোগ মনোরঞ্জনের, মাদূরের ওপর কী যেন সর সর করে যাচ্ছে, সেদিকে না তাকিয়ে সেখানে হাত দিয়ে চলন্ত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কী যেন ঠেকল। সঙ্গে সঙ্গে সে, ওরে বাপরে বলেই মারল এক লাফ। সে একখানা লাফ বটে। বক্কার মাথা ডিঙিয়ে পড়ল অন্য দিকে। বসে বসে কোনও মানুষকে ও-রকম ভাবে লাফাতে কেউ কখনও দেখেনি।

সাপ! সাপ!

অন্য সবাই তখন হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। হ্যাঁ, সাপ বটে, কিন্তু ওটা তো সেই ঢ্যামনাটা। ওটা বাস্তু সাপ, যখন তখন আসে। বুড়ো হয়ে গেছে বেচারা, রেলগাড়ির মতো লম্বা, অত বড় শরীরটা নিয়ে নড়াচড়া করতেই পারে না, ওকে দেখেই মনোরঞ্জনের এত ভয়!

এত হাসি হাসতে লাগল সবাই যে খেলাই ভেস্তে গেল তারপর। যাক, নতুন জামাইকে একবার অন্তত জব্দ করা গেছে। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে বাসনাও হেসেছে।

ছোট পাঁচু বলেছিল, দাদা, বসে বসে ও-রকম আর একখানা লাফ দিয়ে দেখান ত!

রাত্রে শুয়ে শুয়ে মনোরঞ্জন বলেছিল, তোমাদের এ-দিককার লোক তো ঢ্যামনা ছাড়া আর কোনও সাপ দেখেনি, ওরা সাপের মর্ম কী বুঝবে? আমাদের অশ্বিনীকে যেবার কাটল...।

বাসনা স্বামীর বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিল, তুমি রাগ কোরো না, তুমি রাগ কোরো না–

এ বাড়ির মধ্যে একমাত্র তুমি ভাল। আর সব ক'জনা কেমন যেন বেয়াড়া।

তুমি রাগ কোরো না।

এই সেই খাট। এবার ফিরে এসে ওই খাটে আর শোয়নি বাসনা। পুরুষালি উত্তাপের অভাবে ওটা এখন কী দারুণ ঠাণ্ডা!

যতবার মনোরঞ্জনের মুখখানা মনে পড়ে, ততবার বাসনার শরীরটা জ্বরের মতো ঝনঝনে গরম হয়ে যায়। মানুষটা নিজেও যেমন চনমনে, তেমনি অন্য কারুকে কখনও ঝিমিয়ে পড়তে দিত না।

ভরদুপুর, বাড়িতে বিশেষ কেউ নেই, বাসনার মা ঘুমোচ্ছ উঠোনের ও-পাশে বড় ঘরটায়। নারকোল গাছের পাতায় সর সর সর সর শব্দ হতে লাগল। জোর হাওয়া উঠেছে। কালো মেঘে থম থম করে আকাশ। আজ বোধ হয় ঝড় বৃষ্টি হবেই হবে।

খাটের একটা পায়া ধরে সেখানে মাথা ঠেকিয়ে থাকে বাসনা। এত কান্না কেঁদেছে এই কদিন, তবু ফুরোয় না, আবার চোখ ফেটে জল আসে। এত জল কোথায় জমা থাকে? যাদের চোখের জল খরচ হয় না, তাদের সেই জল কোথায় যায়? আর সবই ঠিকঠাক আছে, শুধু একটা মানুষ নেই, তাতেই পৃথিবীটা শূন্য। চোখের সামনেই তাকে দেখা যায়, তার কথাও যেন সব এখনও কানে শোনা যায়, তবু সে নেই।

এই একটা কথা বলব?

কী?

আমাকে একবার কলকাতায় নিয়ে যাবে?

খুব শখ না?

বলো না নিয়ে যাবে কিনা?

আচ্ছা নিয়ে যাব। তোমার বাপ তোমাকে কলকাতা দেখায়নি, আমি দেখাব। শেয়ালদায় আমার এক বন্ধু থাকে, কলকাতা আমার সব চেনা...!

.

এ-পক্ষ আর ও-পক্ষ

মনোরঞ্জনের মা ডলির যদি চোপার জোর থাকতে পারে, তা হলে বাসনার মা সুপ্রভারই-বা থাকবে না কেন? সেই-বা কম যায় কীসে?

বাসনাকে ফিরিয়ে আনার পর থেকেই সুপ্রভা তার স্বামী ও দেওরকে একেবারে ধুইয়ে দিচ্ছে। উঃ, এত বোকাও পুরুষ মানুষ হয়? এরা বোধহয় কাছা দিয়ে ধুতি পরতেও জানে না। জানবেই-বা কী করে, সর্বক্ষণ মোল্লাদের সঙ্গে মিশে মিশে লুঙ্গিই তো পরে। বাসনার বাপ তো চিরকালই একটা জলঢোঁড়া কিন্তু নিতাইচাঁদ নিজে কী করে এমন গোখুরির কাজটা করল? এই সময় কেউ মেয়েকে ফিরিয়ে আনে?

একে তো ভাল করে না দেখে না শুনে হুট করে কোথাকার এক জংলি ছোঁড়ার হাতে তুলে দিল মেয়েকে। সম্বৎসরের খোরাকি ধান তোলার মতো জমি যাদের নেই, সে-বাড়িতে কেউ জেনেশুনে মেয়ের বিয়ে দেয়! কেন, তাদের মেয়ে কি জলে পড়েছিল? এর চেয়ে

যে বাঙাল বাড়িতে বিয়ে দেওয়া ভালো ছিল! এত জায়গা থাকতে শেষ পর্যন্ত কিনা বাদাবন থেকে জামাই আনতে হল। ওই রকম গুণ্ডার মতো চেহারা, ও বাঘের পেটে না গেলেও কোনও দিন নির্ঘাত পুলিশের গুলি খেয়ে মরত! কী-রকম ছোটলোকের বাড়ি ভেবে দেখো, ছেলে মরতে না-মরতেই ছেলের বউকে তাড়িয়ে দেয়! এ-রকম কথা কেউ সাতজন্মে শুনেছে? চশমখোর, চামার কোথাকার!

সুপ্রভার ঢ্যাঙা চেহারা, মুখে সব সময় পান ঠোঁটের পাশ দিয়ে রস গড়ায়, মেটে সিঁদূরের বিষে সিঁথির দু'পাশে অনেকখানি চুল উঠে গেছে। সুপ্রভার স্তন দুটি বেশি লম্বা ও ঝোলা। পঞ্চাশ বছর বয়স পেরিয়ে যাবার পর তার আর লজ্জা-শরমের বালাই নেই।

ঝগড়া-গালাগালি দেবাব সময় সামনে পেলে প্রতিপক্ষ না থাকলেও সুপ্রভার কোনও অসুবিধে হয় না। শ্রীনাথ আর নিতাইচাঁদ কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে। তবু সুপ্রভার গালাগালির শ্রোত চলেছে তো চলেছেই। এরই মধ্যে তার স্বামীকে মাঝে মাঝে খুঁজে এনে সে গলা চড়ায়।

ছি, ছি, ছি, ছি! পুরুষ মানুষ এমন বে-আক্কেলে হয়! হু, পুরুষ মানুষ সেই যে বলে না, গোঁফ নাইকো কোনও কালে, দাড়ি রেখেছেন তোবড়া গালে। একটা উটকপালে মাগির কাছে জব্দ হয়ে এল? যেমন দাদা তেমনি ভাই! ধরলে চিঁ চিঁ ছাড়া পেলেই সিংগি। মেয়েটার হাত ধরে জেটিঘাটে নামল, আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনা! শাঁখা-সিঁদুর পরিয়ে এই ক'মাস আগে মেয়েটাকে পাঠালাম, সেই কপাল-পোড়া মেয়েকে কেউ এমন ভাবে নিয়ে আসে? কী আক্কেল!

এ-রকম চলতেই থাকে অনবরত বাক্যের স্রোত। এক-একবার গলা খাঁকারি দিয়ে শ্রীনাথ বলবার চেষ্টা করে, আহা-হা, তখন থেকে যে বকেই যাচ্ছিস, আমরা কী করতুম তাহলে? মেয়েটাকে বাড়ির বার করে দিয়েছে, জানা নেই শোনা নেই অন্যের বাড়িতে পড়ে আছে, সেখানে ফেলে রাখা কি ভাল দেখায়? কপাল যখন পুড়েছেই– আমাদের মেয়েকে দুটো ভাত-কাপড় আমরা দিতে পারব না?

সুপ্রভা চোখ কপালে তুলে বলে, হায় আমার পোড়া কপাল! কোনঠেকায় কথা কোনঠে গেল। চত্তির মাসে বান হৈল। মেয়েকে ভাত-কাপড় দিতে পারব না, সে-কথা বলিছি? ওগো বুদ্ধির ঢেঁকি, এ-কথা বুঝলে না যে মেয়েটাকে ওরা একেবারে বেড়াল পার করে দিল? এরপর ওরা বলবে, শ্রাদ্ধ চুকবার আগেই বউ চলে গেল, ওই বউয়ের সঙ্গে আর সম্পর্ক নাই। হা-ঘরের বংশের লোক ওরা, ওরা সব পারে!

শ্রীনাথ বলল, সম্পর্ক নাই তো নাই! কে আর ওদের ঘরে মেয়েকে পাঠাচ্ছে। সে তুই যাই বলিস বোকার মা, আমার মেয়েকে আমি আর কোনও দিন ওই নাজনেখালির ছোটলোকের বাড়িতে পাঠাব না। এই একখান কথা আমি কয়ে দিলাম।

এঃ! মরদ বড় তেজি, মারবেন বনের বেজি! একখান কথা আমি কয়ে দিলাম? বলি, দু’ কানে দুটো ফুল, নাকছাবি আর দু’গাছা চুড়ি যে দিয়েছিলুম, সেগুলো যাবে কোথায়? সেগুলো এনেছ, আট মাসের বিয়ে, তার জন্য আমরা ঘরের সোনা গচ্চা দেব?

এবার শ্রীনাথের সম্বিৎ ফেরে। চটাস করে গালে হাত দিয়ে সে বলে, তাই তো!

নতুন ঘরে শুয়ে থেকে মায়ের বকুনি শুনতে শুনতে এত শোক-দুঃখের মধ্যেও এই কথাটি শুনে বাসনাও চমকে ওঠে। সোনার জিনিসগুলো তো আনা হয়নি! একবার মনেও পড়েনি সেকথা!

বিজয়িনীর ভঙ্গিতে এক পাক ঘুরে গিয়ে সুপ্রভা বলল, তবে? আমাদের হকের সোনা ওর ওই শাশুড়ি মাগিটা কেন ভোগ করবে? কেন, শুনি? কেন? কেন?

তাই তো!

শুধু তাই তো বললেই কাজ হবে? হাসিও পায়, কান্নাও ধরে, এ-কথা আর বলি কারে? আর আমাদের ওই জমি?

আমাদের জমি?

সে-জমিটা আমরা এমনি এমনি মিনি মাগনা ছেড়ে দেব?

কী বলছিস তুই, আমাদের জমি কে নেবে?

আমাদের নয় তো কার? বিয়ের ট্যাকায় মনোরঞ্জন এক বিঘে সাত কাঠা তিন ছটাক জমি কেনেনি?

ওঃ হো।

ফের ওঃ হো! তোমার মাথায় ঘিলু দিয়ে গণ্ডাখানেক ঘুঁটে হবে শুধু। সে-জমি কার? ওর বাপের চোদ্দো পুরুষের? আমাদের টাকায় জমি কিনেছে মনোরঞ্জন, গোঁয়ারের মতো সে জঙ্গলে মলল, এখন ও জমি আমরা ভূতের হাতে ছেড়ে দেব? অ্যাঁ? বাপের নামে কেনেনি, মনোরঞ্জন জমি কিনেছে নিজের নামে, স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রী পাবে সেই জমি। পাবে না? বাসনা যদি ওখেনে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকত, ওর জমি কেউ নিতে পারত? এসব ব্যবস্থা না করে তুমি মেয়েটাকে খালি হাতে নিয়ে চলে এলে?

স্ত্রীর বুদ্ধির কাছে হার মেনে শ্রীনাথ গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসল। ওপাশ থেকে নিতাইচাঁদও শুনে ভাবে, এঃ হে, বড়ই কাঁচা কাজ হইয়ে গিয়েছে তো!

এবার ও-দিকের দৃশ্য দেখা যাক।

নাজনেখালিতে বিষ্টুপদ খাঁড়ার বাড়ি একেবারে শান্ত। এদিকে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে বলে বিষ্টুপদ মাঠে গেছে বীজতলা রুইতে। রান্নাঘরের উনুন থেকে গল গল করে বেরুচ্ছে ধোঁয়া, ভিজে কাঠের আঁচ। উঠোনে বসে থুপথুপিয়ে কাপড় কাঁচছে ডলি, দাওয়ায় বসে কবিতা সেলাই করে তার ব্লাউজ। স্বয়ং বিধাতা পুরুষও এখন হঠাৎ এসে পড়লে বুঝতে পারবেন না যে, মাত্র কয়েক দিন আগে এ বাড়ির একটি সমর্থ, বলিষ্ঠ যুবা-ছেলে বাঘের মুখে মারা গেছে।

বিধাতা পুরুষের বদলে উঠোনে এসে দাঁড়ালেন পরিমল মাস্টার। সঙ্গে সাধুচরণ। ডলি ওদের দেখেও দেখল না। আড়চোখে একবার তাকিয়ে বেশি মন দিল কাপড় কাঁচায়।

সাধুচরণ বলল, ও মাসি, মাস্টারমশাই এশ্চেন!

তা আমি কী করব? বাড়ির লোক এখন বাড়িতে নেই।

কবিতা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঠেদাঁড়িয়েছে। তার দুচোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে অভিভূত শ্রদ্ধা। পরিমল মাস্টার তার চোখে সিনেমার নায়কের সমতুল্য। কত বড় বিদ্বান, অথচ সাধারণ চাষা-ভুষোর কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলেন, ঠিক চাষিদের মতো মাঠে উবু হয়ে বসেন।

ডলির থুপথুপানির শব্দ বেড়ে গেছে। ভদ্রলোক শ্রেণীর প্রতি তার একটা রাগ আছে, সে তার সহজাত বুদ্ধি দিয়ে বোঝে যে, তাদের সব দুঃখ কষ্টের জন্য দায়ী শহরের লোকেরা। তাছাড়া, তার প্রথম যৌবন বয়সে এক ছোকরা স্কুলমাস্টার অনেক মিষ্টি মিষ্টি মিথ্যে কথা বলে তার সারা গায়ে হাত বুলিয়েছিল। তখন ছিল সুখ, এখন সেই স্মৃতি ডলির কাছে বিষ। সেই মাস্টার তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও পালিয়েছিল।

কবিতা চাটাই পেতে দেবার আগে পরিমল এসে বসলেন দাওয়ার এক কোণে। তারপর বললেন, মনোরঞ্জনের মা, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।

ডলি কোনও উত্তর দিল না, মুখও ফেরাল না।

বাড়ি থেকে বউটাকে তাড়িয়ে দিলেন?

বেশ করেছি।

একেবারে ফোঁস করে উঠল ডলি। দর্পিতার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, বাড়ি থেকে অলক্ষ্মী ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছি, এখন আমার শান্তি! ছেলে তো গেছে গেছেই। ওই ভাতারখাকিকে দুধ কলা দিয়ে পুষব কেন?

সাধুচরণ অসহিষ্ণু ভাবে বলল, ও মাসি, কী হচ্ছে? একটু চুপকরো না।

পরিমল মাস্টার হাসল।

নাটক নভেলে প্রায়ই গ্রামের আদর্শবাদী স্কুল শিক্ষকের একটা চরিত্র থাকে। তাদের পোশাক হয় পাজামা ও গেরুয়া পাঞ্জাবি, কাঁধে পথিক-ঝোলা। বড় বড় চুল। রবি ঠাকুরের ভাষায় কথা। পরিমল মাস্টারও সেই টাইপের চরিত্র হলেও এই সুমহান ঐতিহ্য তিনি রক্ষা করেনি পোশাকও কথাবার্তায়।

পরনে সেই লুঙ্গি আর একটা গেঞ্জি, পায়ে রবারের চটি। মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে।

ঈষৎ কৌতুকের সুরে, যেন ডলিকে আরও খেপিয়ে তোলার জন্যই সে বলল, কাজটা আপনি ভাল করেননি।

ভাল করিছি কি মন্দ করিছি, সে আমি বুঝব। অন্য কারুর ফোঁপর-দালালি করবার দরকার নেই। যার জন্য আমার ছেলেটাই চলে গেল, সেই রাক্ষুসিকে আমি বাড়িতে রাখব?

কিন্তু এ জন্য পরে যদি আপনাকে পস্তাতে হয়?

রাগের চোটে ডলি প্রায় লাফাতে শুরু করে দিল। মাস্টারবাবুটির এই ধরনের গেরেমভারি কথা সে একেবারে সহ্য করতে পারছে না।

সাধুচরণ থামাবার চেষ্টা করতে লাগল তাকে। পরিমল মাস্টার যেন ব্যাপারটা বেশ উপভোগই করছিল।

সাধুচরণের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, বিড়ি আছে?

বিড়িটি ধরিয়ে সে বলল, মনোরঞ্জনের মা, আপনার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে আসিৰি। রাগ মাগ না করে মন দিয়ে শুনুন। কাগজপত্রে আপনার ছেলের বউয়ের কয়েকটা সই লাগবে। মনোরঞ্জনের নামে বারো হাজার টাকা পাওয়া যাবে।

কে কীসে সই করবে, তার আমি কী জানি?

কত টাকা বললুম, শুনতে পেয়েছেন? বারো হাজার টাকা। আপনারা পাবেন।

এক জন জাদুকর এসে জাদুর মায়া ছড়িয়েছে। ডলি, সাধুচরণ আর কবিতা নিশ্বাস বন্ধ করে, স্থির চক্ষে চেয়ে আছে জাদুকরের মুখের দিকে। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই।

পরিমল সাধুচরণকে উদ্দেশ করে বলল, তোরা যাবার আগে ফর্ম সই করে নিয়েছিলাম, মনে আছে? আমি জানি তো তোদের ধরন। তোদের নামে গ্রুপ ইনসিওরেন্স করিয়ে রাখা আছে। একজন কেউ বাঘের পেটে গেলে তার নামে বারো হাজার টাকা পাওয়া যাবে। তুই মরলে তোর পরিবারও পেত।

মাস্টারমশাই, আপনি আগে তো বলেননি?

কেন আগে বললে তুই ইচ্ছে করে বাঘের পেটে যেতি?

বালতির জলে খলবলিয়ে হাত ধুয়ে আঁচলে মুছতে মুছতে ডলি দৌড়ে চলে এল কাছে। বারো হাজার টাকা আমরা পাব? সে কত টাকা?

পরিমল জিজ্ঞেস করল, জমির দর এখন কত যাচ্ছে রে সাধু? বারোশো টাকা নয়? তাহলে ধরুন, এক লপ্তে দশ বিঘে ধানজমি।

ডলির চোখ দিয়ে জলের রেখা নেমে এল।

সাধুচরণ বলল, এই বুঁচি, শিগগির যা, মাঠ থেকে তোর বাবাকে ডেকে নিয়ে আয়।

কবিতা দাওয়া থেকে লাফ দিয়ে উঠোনে নেমেই ছুটল।

সেই জন্যই তো বলছিলুম বউকে তাড়িয়ে দিলেন, এখন বউয়ের সই না পেলে তো কিছু হবে না। তখন আমি অসুখে পড়েছিলাম।

কেন, বউয়ের সই লাগবে কেন?

বউ নমিনি। বউয়ের নাম লেখা আছে। আইনের চোখে বউই উত্তরাধিকারী।

চোখের জলের ফোঁটা নামতে নামতে থেমে গেল ডলির চিবুকে। এক দৃষ্টে সে চেয়ে রইল পরিমল মাস্টারের দিকে। সেই দৃষ্টিতে মিশে আছে ধিক্কার, অভিশাপ, ঘৃণা আর হতাশা। এই সবই শহরের লোকের ষড়যন্ত্র! মনোরঞ্জন তার পেট থেকে বেরোয়নি? তার নাড়িকাটা ধন নয়? তার শরীরের রক্ত জমানো বুকের দুধ খায়নি ছেলেটা? তার গু-মুত কে পরিষ্কার করেছে? নিজে না খেয়ে ডলি কত দিন তার ছেলেকে খাইয়েছে। জন্মদাতা বাপ পাবেনা, গর্ভধারিণী মা পাবেনা, পাবে একটা পরের বাড়ির আবাগি মেয়ে? আট মাসের বিয়ে করা বউ!

এই অবিচারের জন্য ডলি মনে মনে একমাত্র পরিমল মাস্টারকেই দায়ী করল।

মাস্টারবাবু, আপনি এত বড় একটা ক্ষতি করলেন আমাদের?

এবার পরিমলের অবাক হবার পালা। সে নিজের উদ্যোগে গ্রুপ ইনসিওরেন্স করিয়ে দিয়েছিল, বারো হাজার টাকার বন্দোবস্ত হয়ে আছে, তার পরও তার নামে এই অদ্ভুত অভিযোগ।

সে বলল, ও সাধু, কী বলছেন ইনি? আর একটা বিড়ি দে। কিংবা এক প্যাকেট সিগারেট কিনেই নিয়ে আয়, এ-দিকে পাওয়া যায় না? আচ্ছা থাক, একটু পরে যাস। হ্যাঁ বলুন তো, কী ক্ষতি করলুম আমি?

টাকা আমরা পাব না, সে পাবে?

আহা, হা, সে পাবে মানে কী, আপনারা সকলেই পাবেন। বউকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন, সে এখানেই থাকবে আপনাদের সঙ্গে। তার সই না পেলে তো কিছুই হবে না, তারপর টাকাটা পেলে যাতে পাঁচ ভূতে লুটেপুটে না খায়, জমি-জায়গা কিনে ঠিক মতো খাটানো যায়, সে-ব্যবস্থা আমি করব।

এই সময় ছুটতে ছুটতে হাজির হল বিষ্টুচরণ। উদভ্রান্তের মতো অবস্থা। সে ভেবেছে মাস্টারমশাই বুঝি পকেট বোঝাই করে হাজার হাজার টাকা এনেছেন তাদের দেবার জন্য। বাঘের পেটে মানুষ গেলে যে কেউ টাকা দেয়, সেকথাটা বিষ্টুচরণের কিছুতেই বোধগম্য হবে না। তার মাথায় কেউ হাতুড়ি মেরে বোঝালেও না।

শুধু তো বিষ্টুচরণ নয়, তার পেছনে এল আরও অনেক লোক। মৃত মনোরঞ্জনের বাড়িতে নাকি টাকার হরির লুট হচ্ছে।

সব কিছু যে নির্ভর করছে একটা একরত্তি বিধবা মেয়ের ওপর, এই কথাটা কেউ বুঝছে, কেউ বুঝছে না, এই দু'দলে লাগিয়ে দিলে তর্ক। এরই মধ্যে নিরাপদ এক জনকে 'গাড়োলের মতো বুদ্ধি' বলে ফেলায় সে চটে আগুন! তখন দু'জনে হাতাহাতি লেগে যাওয়ার উপক্রম। অন্যরা ছাড়িয়ে দিল আবার।

পরিমল মাস্টার সামনে যাকে পাচ্ছে, তার কাছ থেকেই বিড়ি চাইছে একটা করে। বিড়ি টানতে টানতে এক সময় সে উদাসীন হয়ে গেল। মনোরঞ্জনের চেহারাটা খুব মনে পড়ছে তার। যেন হঠাৎ সে এক্ষুনি এখানে এসে উপস্থিত হবে!

সে বারো হাজার টাকার ব্যাপারটা বলার পর সবাই এমন উত্তেজিত, যেন মনোরঞ্জন মরে গিয়ে ভাল কাজই করেছে।

গ্রুপ ইনসিওরেন্স ব্যাপারটা চালু হয়েছে ক'বছর মাত্র। এ-দিককার লোক কেউ জানতই না। মাস্টারমশাইয়ের কল্যাণে এর আগে তারা জেনেছে জেলেদের কো-অপারিটিভের কথা, এবার আরও শুনল বাঘে মানুষ মারার খেসারত-এর আজব খবর। মনোরঞ্জনকে মেরেছে বনের বাঘ, তাহলে টাকাটা কি ওই বাঘ দিচ্ছে? বাঘ নয়, গভর্নমেন্ট? মানুষ মরলে গভর্নমেন্টের কী মাথাব্যথা? বাঘের বদলে একটা মানুষ যদি আর একটা মানুষকে মারে, তাহলে সেইমরা-মানুষটার পরিবারকে গভর্নমেন্ট টাকা দেয় না কেন? এ-সব বোঝা সত্যিই খুব শক্ত নয়?

টাকা গভর্নমেন্টও দিচ্ছে না, দিচ্ছে ইনসিওরেন্স কোম্পানি? সে আবার কোন দাতা কর্ণ?

হ্যাঁ, গভর্নমেন্টও দিচ্ছে কিছু। মানুষে মানুষ মারলে গভর্নমেন্ট কিছু দেয় না বটে, কিন্তু বাঘের অভিভাবক হিসেবে গভর্নমেন্ট কিছু দেয়। পরদিন তিনটের লঞ্চে আসা খবরের কাগজে জানা গেল সেই খবর। সুলেখক অরুণাংশু সেনগুপ্তর মর্মস্পর্শী রচনার গুণের জন্যই হোক বা যে-জন্যই হোক, বিধানসভায় সরকারপক্ষ ঘোষণা করেছেন যে, এখন থেকে সুন্দরবনের ব্যাঘ্র-নিহত মানুষের পরিবারকে তিন হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হবে। সরকার শুধু সুন্দরবনের বাঘ সংরক্ষণের ব্যাপারেই উৎসাহী, সেখানকার মানুষদের কথা চিন্তা করেন না, এটা ঠিক নয়।

তাহলে দাঁড়াল, বারো আর তিন পনেরো। জ্যান্ত মনোরঞ্জন থুত্থুরে বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকলেও জীবনে কখনও পনেরো হাজার টাকার মুখ দেখত না।

নাজনেখালির মনোরঞ্জন বাঘের পেটে গেছে বলে তার বাড়ির লোক পনেরো হাজার টাকা পাবে, এ-কথা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটি মানুষেরও জানতে বাকি রইল না। দিল্লিতে ষষ্ঠ যোজনায় কত কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, তা থেকে এ সংবাদ অনেক বেশি মূল্যবান এখানে।

গোসাবার কাছে মালোপাড়ার বিধবাপল্লীতে থান কাপড় পরা মেয়েমানুষরা এ কথা শুনে তাজ্জব। ঘরের পুরুষরা তো সবাই বাঘের পেটে গেছে, কই তারা তো এক পয়সাও পায়নি সে-জন্য?

.

একটি সংক্ষিপ্ত অথচ ঘটনাবহুল অধ্যায়

এবার আর মিনমিনে শ্রীনাথকে সঙ্গে আনা হয়নি। নিতাইচাঁদের সঙ্গে এসেছে বদ্যিনাথ, আর মাঝপথে জুটে গেছে ফটিক বাঙাল। এই ফটিককে সঙ্গে আনার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না নিতাইচাঁদের, সে এরই মধ্যে বাসনার সঙ্গে গুজ গুজ ফুসফুস শুরু করেছে। তবু টাকা-পয়সার ব্যাপার, লোকবল থাকা ভাল। বাসনার গয়না উদ্ধার করতে হবে এবং সম্ভব হলে এবারই বেচে দিয়ে যেতে হবে ওই এক বিঘে সাত কাঠা তিন ছটাক জমি।

নিতাইচাঁদ ভেবেছে যে ফটিক বাঙালের সঙ্গে বুঝি হঠাৎই দেখা হয়ে গেছে লঞ্চে, কিন্তু ফটিকের জীবনে সব কিছুই হিসেব করা। তিরিশ একত্রিশ বছর বয়েস ফটিকের, এর মধ্যে সে তিনটি বিয়ে করেছে পুরুতের সামনেই। আরও বাদ বাকি তো আছেই। দুর দূর গ্রামে সে বিয়ে করে আসে নাম ভাঁড়িয়ে, তারপর এক বছর দেড়-বছর বাদে বউ ছেড়ে পালাতে তার কোনও রকম দ্বিধা থাকে না। মেয়েরা তার কাছে মিষ্টি আখের মতো, যতক্ষণ রস ততক্ষণ সোহাগ, তারপর সারা জীবন ছিবড়ে বয়ে বেড়াবার মতো আহাম্মক সে নয়।

ছিপছিপে ফর্সা মতো চেহারা, চোখ-নাক চোখা, দৃষ্টি সর্বদাই চঞ্চল। ফটিক ছেলেটি প্রতিভাবান, নইলে এত মেয়ে পটাপট পটে কেন তাকে দেখে? কথাবার্তায় অতি তুখোড়। এত দিনের মধ্যে মাত্র একবার সে হাঁসখালি গ্রামে ধরা পড়ে মার খেয়েছিল। সেকী শুয়োর-পেটা মার! তারপর তিন মাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল তাকে। তবু মেয়ে ধরাই এখনও ফটিকের জীবিকা।

গত কাল দুপুরে পুকুরে স্নান করতে করতে ফটিকের মাথায় একটা ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল হঠাৎ। বাসনা বিধবা হয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে, এ খবর ফটিক যথাসময়ে পেয়েছে। প্রথমে সেও নিয়ে মাথা ঘামায়নি। কিন্তু পুকুরের কোমরজলে দাঁড়িয়ে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এবং তৃতীয় নেত্র যেন

আচমকা তাকে বলে দিল, এই মেয়েটার মধ্যে মধু আছে। ওরে ফটিক লেগে যা।

কয়েক দিন ধরে আড়ালে আড়ালে তক্কে তক্কে থেকে সব খবর সংগ্রহ করেছে ফটিক। বাসনারা যে আজ এই লঞ্চে যাবে, সে আগেই জানে। কিন্তু এক সঙ্গে এলে যদি কেউ সন্দেহ করে সেই জন্যই নিজের গ্রাম থেকে না উঠে সে পাটনাখালির কলেজ ঘাট থেকে লঞ্চ ধরেছে। ছাদে, কেবিনঘরে পিছনে ঠেস দিয়ে জবুথবু হয়ে বসে আছে বাসনা, এক পাশে তার দাদা, অন্য পাশে কাকা। ওদের দেখে কত স্বাভাবিক ভাবে চমকে উঠল ফটিক।

মেয়েদের মন কী করে জয় করতে হয়, তা জানার জন্য ফটিককে ডেল কার্নেগির বই পড়তে হয়নি। সে ঠিকই জানে যে, সদ্য বিধবা মেয়ের সঙ্গে ভাব জমাবার শ্রেষ্ঠ উপায় তার মৃত স্বামীর প্রশংসা করা। সহানুভূতি বড় চমৎকার সিঁড়ি, একেবারে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেয়।

অ-বাঙাল মেয়ের সঙ্গে কক্ষনও বাঙাল ভাষায় কথা বলে না ফটিক। এ ব্যাপারে সে খুব সতর্ক।

ভগবানের কী বিচার! আমাদের মতো হেঁজিপেঁজি অকম্মা লোকদের নেয় না, আমরা বাঁচলেই-বা কী, মলেই-বা কী, আর নাজনেখালির মনোরঞ্জন খাঁড়া, অমন সোন্দর চেহারা, আর কী দরাজ দিল, সেই মানুষটাকে অকালে নিয়ে গেল।

এইভাবে কথা শুরু করে ফটিক। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, জীবন অনিত্য, কে কবে আছি, কবে নেই। দু’জন মাছের চালানদার এই মূল্যবান দার্শনিক

তত্ত্বটিতে খুব মনোযোগের সঙ্গে সায় দেয়। এক জন মন্তব্য করে, যা বলেছেন দাদা, আমাদের বাঁচা-মরা দুই-ই সমান। বোঝা যায়, বহু দিনের নিষ্ফল অভিমান থেকে এই কথাটা বেরিয়ে আসছে।

রাজযোটক যাকে বলে? এমন বিয়ে কটা হয়? পাত্রটি যেমন ভাল, তেমন আমাদের গাঁয়ের মেয়েও রূপে-গুণে কিছুকমতি নয়, এরকম মিল সহজে দেখা যায় না। তা-ও সহ্য হল না ভগবানের?

মাথায় ঘোমটা দিয়ে কলা-বউ-এর মতো নিথর হয়ে বসে আছে বাসনা। মাঝে মাঝে ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে শুধু। ফটিক তাকে উদ্দেশ করে একটানা ওই ধরনের কথা বলে চলল।

ফটিকের নির্লজ্জতায় নিতাইচাঁদ প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে যায়। এই ছোঁড়াই বাসনাকে নিয়ে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। ইচ্ছে হয় একটা লাথি মেরে ছোঁড়াটাকে নদীতে ফেলে দিতে।

নিতাইচাঁদের দিকেই তাকিয়ে ফটিক এর পরে বলল, কাকা কেমন আছেন? কইখালির নেবারণ দাস আপনার খুব সুনাম কচ্ছিল, আপনি নাকি বিনা সুদে ওকে দুশো টাকা হাওলাত দিয়ে অসময়ে বড় বাঁচা বাঁচিয়েছেন?

নিতাইচাঁদকে বাধ্য হয়েই হাসতে হয় একটু প্রশংসা শুনে খুশি হয়ে পারা যায়? নিবারণ দাসের কাছ থেকে সুদ নেওয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কোনও জামিন ধরা হয়নি, সেই জন্য সে সুনাম করেছে?

ফটিক এরপর বদ্যিনাথের দিকে ফিরে বলল, ভূতোদা, তোমার পার্টি নাকি তাসের টুর্নামেন্ট জিতেছে? খেজুরিয়াগঞ্জে খেলতে যাবে? বড় খেলা আছে।

যাদের লোক চরিয়ে খেতে হয়, তাদের সব রকম খবরও রাখতে হয়। যে-লোকের সঙ্গে একবার পরিচয় হয়েছে, তার নাড়ি-নক্ষত্রের সন্ধান জানে ফটিক। বদ্যিনাথ একবার একটু উঠে গেলে ফটিক তার জায়গাটায় বসে, বাসনার পাশে।

গাদাগাদি ভিড়ে লঞ্চে এখন কে কোথায় বসল, তা নিয়ে কোনও কথা চলে না। ইঞ্জিনের ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দের জন্য কেউ কথা বললে একটু দূরের লোক শুনতে পায় না। ফটিক ফিস ফিস করে বাসনাকে বলল, জীবনে এ- রকম দুঃখ এলে, সে দুঃখ অন্য কারুর সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়। তবেই না তা সওয়া যায়?

বাসনা ডাগর চোখ মেলে তাকাল ফটিকের দিকে। এই মানুষটির জন্য তাকে এক দিন দারুণ লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে, তবুএর ওপর সে রাগ করতে পারল না। ফটিকের মুখখানাই এমন যে, তাকালে আর রাগ থাকে না। তাছাড়া এত ঝগড়াঝাটির মধ্যে এই এক জন মাত্র লোক শুধু কত নরম করে শুধুদুঃখের কথাটাই বলল।

মনোরঞ্জনের ছবি আছে তোমার কাছে?

ছবি?

ফটো তুলে রাখোনি এক সঙ্গে? গোসাবায় তো পাঁচ টাকায় ফটো তুলে দেয়। ইস, কী নিয়ে কাটাবে সারা জীবন!

কোনও রকম স্বার্থের গন্ধ নেই ফটিকের কথার মধ্যে। একটি নীতিতে ফটিক সব সময় অটল থাকে, ধীরে বন্ধু ধীরে!

এক সময় গলা খাঁকারি দিয়ে নিতাইচাঁদ জিজ্ঞেস করল, তুমি ইদিকে কোথায় যাচ্ছ ফটিক?

আজ্ঞে কাকা, আমি যাচ্ছি নাজনেখালি, সেখানে আমার এক মাসির বাড়ি-।

তাহলে চলো আমাদের সঙ্গে বাসনার শ্বশুর বাড়িতে একটু গোলমাল কচ্ছে, তুমি আমাদের গাঁয়ের ছেলে, একটু পাশে দাঁড়াবে।

নিশ্চয়ই, ফটিক তো তাই-ই চায়। লঞ্চে সেকি হাওয়া খাওয়ার জন্য উঠেছে? তার মাসির বাড়ি সারা পৃথিবীতে ছড়ান।

বাসনার যেন কোনও ইচ্ছে-অনিচ্ছে নেই। সে কোথায় থাকবে কোথায় যাবে, তা সে নিজেই ঠিক করতে পারে না। শ্বশুর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল, চলে এল বাপের বাড়ি, আবার বাপের বাড়ির লোকই তাকে নিয়ে চলেছে শ্বশুর বাড়ি। সেখানে গেলে যে আবার কী কুরুক্ষেত্র শুরু হবে, তা ভাবলেই বাসনার রক্ত হিম হয়ে যায়। তার একটুও যেতে ইচ্ছে করছে না। ও-বাড়ির পেছনের একটুখানি জমিতে বেগুন গাছে ফুল দেখে এসেছিল বাসনা। এখন সেখানে নিশ্চয়ই কচিকচি বেগুন ফলেছে। মনোরঞ্জন নিজে হাতে ওই বেগুনের খেত করেছিল। বাসনা সে-দিকে কী করে তাকাবে? ধানের গোলা, ঝিঙের মাচা, সব কিছুতেই মনোরঞ্জনের হাতের ছাপ।

নাজনেখালি এসে গিয়েছে বলে কিছু লোক উঠে দাঁড়াতেই তার বুকের মধ্যে দুপ দুপ করে উঠল। এই জায়গাটার নাম শুনলেই তার এ-রকম হচ্ছে কদিন ধরে। বিয়ের আগে নাজনেখালির নামই শোনেনি।

জেটিঘাটায় নামতেই বোকা নগেন দাসের সঙ্গে দেখা।

প্রত্যেক দিন এই সময় নগেন দাস এখানে দাঁড়িয়ে থাকে। সে কোনও দিন লঞ্চে উঠে কোথাও যায় না, তার কাছে কেউ আসে না, তবু এই একটা নেশা। এই লঞ্চের মানুষজনের ওঠা-নামা দেখাই তার কাছে একঝলক বাইরের পৃথিবী দেখা।

নিতাইচাঁদকে সে নিজেই ডেকে বলল, ওমশাই আবার এসেছেন? ভাল করেছেন। খবর শুনেছেন তো?

আর এক জন লোক বলল, এই তো মনোরঞ্জন খাঁড়ার বউ ফিরে এসেছে।

অন্য এক জন বলল, তাহলে আর চিন্তা নাই, বিষ্টু খাঁড়ার কপালডা ফিরা গ্যাল এবার।

ভুরু দুটো নেচে উঠল নিতাইচাঁদের। কী ব্যাপার? এরা কী বলতে চায়?

দু'পা বাড়ালেই মোচা বিষ্টুর চায়ের দোকান। সেখানে এসে চায়ের অর্ডার দিল ফটিক। একদল লোক তাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। বাসনাকে বানো হল বাণী কাঠের তক্তার বেঞ্চে।

আপনে শোনেন নাই, মনোরঞ্জনের বউয়ের নামে ভারত সরকার আর বাংলা সরকার পনেরো হাজার টাকা দেবে!

সাহেবরাও আরও কিছু দিতে পারে শুনছি।

আমেরিকা দেবে।

আমেরিকা দিলে রাশিয়াও দেবে।

দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধী ওর হাতে প্রাইজ দেবেনা?

একটা হাসির রোল পড়ে যায়। মনোরঞ্জন খাঁড়ার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বেশ একটা রসিকতা জমে উঠেছে। বাঘে মরলে পনেরো হাজার টাকা। তুমি জলে ডুবে মরা, কেউ তোমাকে পাত্তা দেবে না। তুমি যদি ওলাউঠোয় মরলে তো মরলে, ব্যাস, ফুরিয়ে গেল! এমনকী, তোমাকে পাগলা কুকুরে কামড়াক কিংবা জাতসাপে কাটুক, কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। কিন্তু বাঘে তোমার ঘাড় ভেঙে দিলেই পনেরো হাজারটি টাকা পেয়ে যাবে। গভর্নমেন্ট দেবে। চমৎকার ব্যাপার না?

নিতাইচাঁদ একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। কিছুই বুঝতে পারছে না। পনেরো হাজার টাকা কাকে বলে এরা জানে? ওই মেয়ে এত টাকা পাবে কেন!

ফটিকের বুকের মধ্যে রেলগাড়ির ইঞ্জিন চলছে। তার মন বলেছিল না, এই মেয়ের মধ্যে মধু আছে? পনেরো হাজার টাকা। দেখা যাক ওই টাকা কে পায়! তার নাম ফটিক লস্কর।

নদীর ধারের বাঁধের ওপর দিয়ে দলে দলে লোক আসছে বাসনাকে দেখবার জন্য। আজ হাটবার, এমনিতেই অনেক লোক আসতে শুরু করে এখন থেকেই।

রীতিমতো ভিড় জমে গেল বাসনাকে ঘিরে। আর সেই সঙ্গে নানা রকম গুঞ্জন। মনোরঞ্জন খাঁড়ার বিধবা বউ এখন দারুণ এক দ্রষ্টব্য ব্যাপার। এক গলা ঘোমটা টেনে ওই যে পুঁটুলিটা নিয়ে বসে আছে, তার হাতের একটা সই-এর দাম এখানকার সকলের চেয়ে বেশি।

ফটিক নিতাইচাঁদের কাঁধে হাত ছুঁইয়ে বলল, কাকা একটু শোনেন!

তারপর ভিড়ের জটলা থেকে নিতাইচাঁদকে খানিকটা দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে দারুণ উত্তেজিত ভাবে বলল, কাকা ব্যাপারটা বোঝলেননি? আপনাগো মাইয়া এখানে আনছেন, সব টাকা তো অরা লইয়া যাবে।

নিতাইচাঁদ বলল, কার টাকা? কীসের টাকা বলো তো?

ওই যে শোনলেন না? মনোরঞ্জনরে বাঘে খাইছে, সেই জন্যই সরকার ক্ষতিপূরণ দেবে। অনেক টাকা। ক্ষতি কার, আপনাগো না?

এমন যে ধুরন্দর নিতাইচাঁদ, তারও বিষয়টা মাথায় ঢুকছেনা এখনও। ফটিক অতি দ্রুত বুঝিয়ে দিল।

তাহলে এখন উপায়?

কাকা, এই ফটিক বাঙালের পরামর্শ যদি শোনেন, তাহলে আমি কই চলেন এখনি আমরা ফিরা যাই।

ফিরে যাব?

বাসনারে একবার শ্বশুর বাড়ি লইয়া গ্যালে হ্যারা আর ছাড়বে অরে? বাসনারে দিয়া সই-সাবুদ করাইয়া সব টাকা অরা হজম কইরা দেবে না?

টাকা…ওরা নেবে?

নেবে না? একবার বাসনার সই পাইলেই হয়!

তাহলে এখন উপায়?

চলেন, এক্ষুনি ফিরা যাই। মনোরঞ্জনের বাবা আইস্যা কইলেও আপনে বাসনারে ছাড়বেন না, কিছুতেই ছাড়বেন না। আমাগো গ্রামের মেয়ে, আমাগো গ্রামেই থাকবে।

লঞ্চ ছেড়ে গেল, এখন আমরা ফিরব কী করে?

সে-ব্যবস্থা আমার, আপনে যান বাসনার হাত ধইরা থাকেন, অগো সাথে কথা কইয়া সময় কাটান গিয়া একটু।

সত্যিই করিৎকর্মা ছেলে বটে ফটিক। হাটবার বলে অনেক নৌকো এসে লেগেছে আজ। তারই মধ্যে একটি নৌকোর মাঝির সঙ্গে সে দরাদরি করে ঠিক করে ফেলল।

তারপর ছুটে এসে বলল, কাকা, চলেন।

বদ্যিনাথ কিছু বুঝতে পারেনি। সে বলতে লাগল, কোথায়? কোথায়? মনোরঞ্জনদের বাড়ি তো এ-দিকে।

আগে একবার জয়মণিপুরে যেতে হবে, শিগগির।

ওদের দলটি আবার জেটিঘাটের দিকে ফিরে যেতেই ভিড়ের লোকজন বলল, এ কী, ওরা চলে যায় যে!

বিষ্টরা কোনও খবর পেল না।

অবাক কাণ্ড, এখনও চিতের ধোঁ উডল না, আর বউ ড্যাংডেঙিয়ে চলল বাপের বাড়ি।

আবার এলই-বা কেন, ফিরে চললই-বা কেন?

মাঝপথে খেলা ভেঙে যেতে মজাটা যেন জমল না। সদ্য বিধবা বউ, বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়িতে এসে লঞ্চঘাটে পা দিয়েই ফিরে যাচ্ছে, এ কেমন ধারা ব্যাপার! দু-চার জন চলে গেল মনোরঞ্জনের বাপ-মাকে খবর দিতে।

ফটিক নিজে বাসনার হাত ধরে তুলল নৌকোয়। নিতাইচাঁদ কেমন যেন ন্যাবড়জ্যাবড়া হয়ে গেছে। নৌকোর দড়ি খুলে মাঝিকে তাড়া দিয়ে ফটিক বলল, আরে ভাই, ছাড়েন ছাড়েন।

ভাটার সময়। তবু নাজনেখালি থেকে যত তাড়াতাড়ি দূরে চলে যাওয়া যায়, ততই মঙ্গল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই হইহই করে এসে গেল সাধুচরণের দল। ভিড় ঠেলে এসে জেটিঘাটের ওপর দাঁড়িয়ে তর্জন-গর্জন করতে লাগল।

মাধবদা, তোমার চোখের সুমুখ দিয়ে মনোরঞ্জনের বউকে নিয়ে চলে গেল, আর তুমি কিছু বললে না?

মাধব একমনে গাঢ় নীল রঙের নাইলনের জাল ধুয়ে পরিষ্কার করছিল, সম্পূর্ণ অনুত্তেজিত দুটি চোখ তুলে সে তাকাল ওদের দিকে। ওরা আরও অনেক কথা বলে যাচ্ছে, মাধব চুপ।

তারপর হঠাৎ সে ধমক দিয়ে বলে উঠল, তা আমি কী করুম? পরের বউ লইয়া টানাটানি করুম?

তা বলে আমাদের গাঁয়ের বউকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে?

যার যা ইচ্ছে করুক।

প্রথমে প্রায় লাফিয়ে পড়ল নিরাপদ, তারপর সাধুচরণ, সুশীল, বিদ্যুৎ, সুভাষ সবাই নেমে এল নৌকোর ওপরে। আশপাশের কয়েকখানা নৌকো থেকে তারা চেয়ে নিল কয়েকটা দাঁড়, সবাই ঝপাঝপ হাত চালাল এক সঙ্গে।

ফটিক, নিতাইচাঁদ পেছন দিকে তাকিয়েই ছিল, ওরা এক নজর দেখেই বুঝতে পারল একখানা নৌকো তেড়ে আসছে ওদের দিকে। ফটিক চেঁচিয়ে উঠল, হাত চালাও, ও দাদা, হাত চালাও, আমাদের যেন ধরতে না পারে।

তারপর শুরু হল নৌকো বাইচ।

কিন্তু নাজনেখালির জয়হিন্দ ক্লাবের দুর্দান্ত মেম্বারদের সঙ্গে পারবে কেন মামুদপুরের লোকেরা! নিতাইচাঁদ আর বদ্যিনাথ দু'জনেই বাবু ধরনের, তারা নৌকোর দাঁড় ধরতে জানে না।

মাধবের নৌকো একেবারে ঠাস করে লাগল নিতাইচাঁদের ভাড়া নৌকোর গায়ে। সাধুচরণ আগে থেকেই ঝুঁকে ছিল, খপ করে চেপে ধরল বাসনার হাত।

নিতাই বলল, এই, এই, আমাদের মেয়ের গায়ে হাত দেবে না।

নিরাপদ বলল, শালা, চোর, আমাদের গেরামের বউকে চুরি করে পালাচ্ছ।

দু'দলই হাতের দাঁড়গুলো উঁচু করে তুলেছে, এই বুঝি কাজিয়া বাধে।

সাধুচরণ বাসনার হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই উলটে গেল নিতাইচাঁদদের নৌকোটা। বেগতিক বুঝে ঠিক সেই মুহূর্তেই ফটিক জলে ঝাঁপ দিয়েছে।

অত্যন্ত কেরামতির সঙ্গে নিজের নৌকোটা সামলে আছে মাধব। এই সব ব্যাপারটিতেই সে বিরক্ত। সে সংসারী লোক, তাকে আবার জড়িয়ে পড়তে হবে ঝঞ্ঝাটে। সে চ্যাঁচাতে লাগল, আরে বইস্যে পড়, বইস্যে পড়, হারামজাদারা, এডারেও উলটাবি!

এত বড় একখানা নদীতে কেউ কোনওদিন সাধ করে একবারও ডুব দেয় না। ঘাটের কাছেও স্নানে নামে না। এমন কামটের উৎপাত। সেই নদীর জলে এতগুলো মানুষ। বাসনার হাত ছাড়েনি সাধুচরণ, তাকে ডুবতে দেয়নি। নিতাইচাঁদকেও টেনে তুলল সুভাষ আর বিদ্যুৎ। বদ্যিনাথ কিছুক্ষণ হাবুডুবু খেল। মাঝি দু'জন অনেক কষ্টে আবার ভাসিয়ে তুলল তাদের নৌকোটাকে।

শুধু তলিয়ে গেল ফটিক, তাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। তবে, সত্যি সত্যিই কি আর তলিয়ে যাবে? বাঙলা দেশের ছেলে, ওরা নাকি জলের পোকা, ভুস করে আবার কোথাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে ঠিকই।

ধুতির কাঁছা-কোঁচা খুলে গেছে, নিতাইচাঁদের মাথা থেকে জল গড়াচ্ছে, ত্রিভঙ্গ মুরারির মতো দাঁড়িয়ে তড়পাতে লাগল, আমি থানায় যাব...জুলুমবাজি...এ কি মগের মুলুক...তোদের সব কটার কোমরে দড়ি দিয়ে জেলের ঘানি ঘুরাতে না পারি...আমার নাম নিতাইচাঁদ সাধু নয়। দিনদুপুরে ডাকাতি...মেয়েছেলের গায়ে হাত...আমি ছাড়ব না। সবকটাকে আমি...।

সেয়ানে সেয়ানে

এবার দারোগার কথা।

গৌর দারোগা নিছক এক রঙা মানুষ নয়। ধপধপে সাদা বা কুচকুচে কালো রঙ দিয়ে তার চরিত্র আঁকা যাবেনা নিছক সত্যের খাতিরেই।

সচরাচর মফঃস্বলের মাঝবয়েসি দারোগাদের মত গৌরহালদারের পেটমোটা চেহারা নয়, বেশ লম্বা বলশালী শরীর, গায়ের রঙ শ্যামলা, মুখটা অনেকটা মঙ্গোলীয় ধরনের, চোখ ছোট এবং কম কথা বলা স্বভাব। থানার বাইরে বেরোতে না হলে তিনি ধুতির ওপর হাফশার্ট পরে থাকেন।

কেউ বলে, ওরে বাপ রে, এমন চশমখোর লোক আর হয় না। সেই যে যতীন ঘোষাল দারোগা ছিল কাঁচারক্তখেকো দেবতা, বছর দশেক আগে যার ভয়ে এ তল্লাটের মানুষ ভয়ে কাঁপত, সবাই ভেবেছিল এমন নিষ্ঠুর মানুষ আর হয় না। এই গৌর হালদার যেন তাকেও ছাড়িয়ে যেতে চায়। আবার কেউ বলে, গৌর দারোগা যেন ঝুনো ডাব, বাইরে শক্ত কিন্তু ভেতরে দয়া-মায়া আছে। কেউ বলে, পয়সা চেনে বটে গৌর দারোগা। পিঁপড়ের পেছন টিপে মধু বার করতে জানে। আবার কেউ বলে, শুধুহাতে থানায় গেলাম, বড়বাবুকথা শুনলেন, ঠারেঠোরেও পয়সা চাইলেন না। অথচ কাজ হাসিল হয়ে গেল। এমনটি আগে কখনও দেখিওনি, শুনিওনি।

একই মানুষ সম্পর্কে এমন পরস্পর-বিরোধী কথা শোনা যায় কী করে? এ কোন রহস্য?

রহস্যটি আসলে সরল।

এই বাদা অঞ্চলে মোটমাট চার রকমের মানুষ। বন কেটে বসতির সময় এক দল এসেছে উড়িষ্যা থেকে, একদল মেদিনীপুর থেকে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা আগেও এসেছে, পরেও

এসেছে, আর এসেছে মুসলমান। এই চার রকমের মানুষ এত দিনেও এক সঙ্গে মিশে যায়নি, এদের আলাদা পাড়া ও আলাদা অস্তিত্ব আছে। উড়িষ্যার লোকেরা সবাই এখন খাঁটি বাংলায় কথা বললেও নিজস্ব সামাজিক পরিচয় মুছে ফেলেনি। আর মুসলমানদের সবাইকেই এখানে অন্যরা বলে মোল্লা।

গৌরহালদারের পক্ষপাতিত্ব আছে বিশেষ একসম্প্রদায়ের প্রতি। ইনিও পার্টিশানের পরে আসা রিফিউজি। যাদবপুরের কলোনিতে জলকাদা, নোংরা, মশা-মাছি, লাঞ্ছনা, অপমান ও দারিদ্রের মধ্যে কেটেছে শৈশব ও কৈশোর। তারপর ভাগ্যচক্রে পুলিশে কাজ পেয়েছেন। এবার তিনি প্রতিশোধ নিতে চান। তিনি যে শুধু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ঘোর সাপোর্টার, তাই নন। পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দুদের তিনি অন্তর থেকে ঘৃণা করেন। যাদবপুরে থাকার সময় ছাত্রাবস্থায় খেলার মাঠে তিনি মোহনবাগানের দর্শক গ্যালারির দিকে নিয়মিত ইট মারতেন, হাত-বোমাও ছুঁড়েছেন কয়েক বার।

গৌর হালদার শুধু বাঙাল নন। বাঙালদের মধ্যেও সূক্ষ্ম ভেদাভেদ মানেন তিনি। তাঁর জন্ম টাঙ্গাইলে, তিনি মনে করেন টাঙ্গাইল, মৈমনসিং, ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহি নিয়ে যে একটি বৃত্ত, এখানকার মানুষই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। ফরিদপুর-যশোর-খুলনার বাঙালরাও ঠিক বাঙাল হিসেবে ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কারণ পশ্চিমবঙ্গের সংস্পর্শে আগে থেকেই ওদের খানিকটা চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, নিছক বাঙাল নামের জন্যই ওরা খানিকটা সহানুভূতি পাবার যোগ্য।

ওড়িয়া, মুসলমান এবং কিছু কিছু সাঁওতালও যে আছে বাদা অঞ্চলে, তাদের প্রতি গৌরহালদারের কোনও বিদ্বেষ নেই, তারা বিপদে পড়লে তিনি সাধ্য মতো সাহায্য করেন। তাঁর সমস্ত রাগ শুধু পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দুদের ওপর। বিশেষত কলকাতা শহর থেকে যেসব জমির মালিক বা ভেড়ির মালিক মাঝে মাঝে এখানে আসে টাকা নিয়ে যাবার জন্য, তাদের কোনওক্রমে বাগে পেলে গৌর হালদার একেবারে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে ফেলেন। অনেক সময় আইনের পরোয়া না করে বে-আইনি ভাবেও তাদের নির্যাতন বা হয়রান করেন কিংবা অর্থদণ্ড ঘটান। টাঙ্গাইলের ছোট্ট ছিমছাম বাড়ি, পুকুর, ধান জমি

সব ছেড়ে অসহায় ভাবে চলে এসেছেন এক সময়, তবু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আতিথেয়তার হাত বাড়িয়ে দেয়নি। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-উপহাস করেছে, যাদবপুরের জলাভূমিতে শুয়োরের খোঁয়াড়ের মতো ঘরে থাকতে দিয়েছে। সে-রাগ তিনি কখনও ভুলতে পারেন না। অর্থাৎ তিনি প্রায় একটি গুপ্ত-উন্মাদ।

মরিচঝাঁপির দ্বীপ থেকে যখন বাঙালখেদা অভিযান হয়, সেবার শোকে-দুঃখে রাগে-অভিমানে গৌর হালদার তিন মাসের ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে অসহায় ভাবে হাত কামড়েছেন। তারপর আবার কাজে যোগ দিয়েই তিনি অ-বাঙাল হিন্দুদের ওপর বাড়িয়ে দিয়েছেন অত্যচারের মাত্রা। অবশ্য, এসবই গৌর হালদারের মনে মনে। বাইবে কিছু প্রকাশ করেন না। গৌরহালদারের ছেলে-মেয়েরা, যারা জীবনে কখনও পূর্ব বাংলায় যায়নি, তারাও যদি বাড়িতে কখনও বাঙালভাষা না বলে ঘটি ভাষায় কথা বলে ফেলে, অমনি গৌর হালদার কানচাপাটি বিরাশি শিকা থাবড়া মারেন তাদের। বাইরে যত ইচ্ছে ঘটিভাষা বলুক, বাড়িতে চলবেনা।

নাজনেখালির বাঘে-খাওয়া মনোরঞ্জনের বৃত্তান্ত ইতিমধ্যেই কানে এসেছে গৌর হালদারের। জয়মণিপুবে সব ব্যাপারে নাক গলানো ইস্কুল মাস্টারনিটির হাতে লেখা একটি দরখাস্তও তার কাছে এসেছে, তিনি চুপচাপ চেপে বসে আছেন। ওরা ভেবেছে একখানা কাগজ পাঠিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। গৌরহালদারের সঙ্গে একটি বার দেখা করারও দরকার নেই, না? আচ্ছা?

নিতাইচাঁদ গৌর হালদারের কাছে এসে সুবিধে করতে পারল না। দারোগাবাবুর মন ভেজানোর জন্য সে অনেক রকম কাঁদুনি গাইল। সবকথা শুনে ডায়েরি না লিখেই হাঁকিয়ে দিলেন নিতাইচাঁদকে। ছেলের বউকে শ্বশুর বাড়ির লোকেরা নিজেদের কাছে রাখতে চায়, এতে আবার নারী-হরণ কী? বেয়াইতে বেয়াইতে কোঁদল, এর মধ্যে পুলিশ নাক গলাতে যাবে কেন? নৌকো ডুবিয়ে দিয়েছে? তা সে নৌকোর মাঝি কোথায়? তাকে ডাকো, কেস লেখাতে হয় সে লেখাবে।

ভাড়া নৌকোর মাঝির বয়েই গেছে থানায় আসতে। সুখে থাকতে সাধ করে কে ভূতের কিল খেতে যাবে।

নিতাইচাঁদ আরও অনেক ভাবে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করল বাসনাকে। দু-চারটে লোক লাগাল। যদি হাটবারে ভিড়ে গণ্ডগোলে কোনও রকমে ফুসলে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু নাজনেখালির জয়হিন্দক্লাবের সদস্যদের কড়া পাহারায় তা হবার উপায় নেই। থানাতে ঘোরাঘুরি করেও কোনও সুরাহা হল না। শেষ পর্যন্ত নিতাইচাহাল ছেড়ে দিল।

এরপর এক দিন এল সাধুচরণ। পরিমল মাস্টার পাঠিয়েছে। এই সাধুচরণকে গৌর হালদারই জেলে পাঠিয়েছিলেন। তার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে গৌর হালদার বললেন, কী রে, আবার জেলের ভাত খাবার শখ হয়েছে বুঝি? ধান কাটার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর, আবার তোকে পাঠাব।

সাধুচরণ বলল, মাস্টারমশাই বললেন…।

তোদের মাস্টারমশাই কোন লাট সাহেব? নিজে আসতে পারে না?

বাসনার সই পাবার পর ইনসিওরেন্সের ব্যবস্থাটা অনেকটা পাকা হয়ে গেছে। চিঠি লেখালেখি হয়েছে সরকারের সঙ্গে। এখন দরকার শুধু থানার রিপোর্ট।

অতএব পরিমল মাস্টারকেই সশরীরে আসতে হল এক দিন।

গৌর হালদার সসম্রমে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন, আসুন, মাস্টারমশাই আসুন। ওরে, একটা চেয়ার দে। চা খাবেন তো? নাকি ডাব খাবেন? আমাদের থানার কম্পাউন্ডে বড় বড় পাঁচটা নারকোল গাছ।

শুধু মাস্টারমশাই তো নন, সোস্যাল ওয়ার্কার, অনেক টাকার প্রজেক্ট চালাচ্ছেন, এঁদের একটু খাতির দেখাতেই হয়। দু-চারজন মন্ত্রী-টন্ত্রীর সঙ্গে চেনা থাকে এঁদের। হুটহাট করে হোম সেক্রেটারি কিংবা চিফমিনিস্টারের পিএ বেড়াতে আসেন এঁদের কাছে।

গৌর হালদার নিজে একটা চেয়ারের ধুলো ঝেড়ে বসতে দিলেন পরিমল মাস্টারকে। একই সঙ্গে চা আনাবার জন্য এবং ডাব পাড়বার জন্য হাঁকডাক করতে লাগলেন জমাদারদের। বিশিষ্ট অতিথিরসম্মান জানাতে গৌর হালদারের যেন কোনও কার্পণ্য নেই।

টেবিলের দু'পাশে দু'জন মুখোমুখি বসবার পর গৌর হালদার তার ছোট ছোট চোখ দু'টির তীব্র দৃষ্টি স্থাপন করলেন। এই পরিমল মাস্টারের মতো লোকরাও তার এক নম্বরের শত্রু। শহরের লোক। নেহাত ভাগ্যগুণে পশ্চিমবঙ্গে জন্মেছে বলেই সারা জীবন পাকাবাড়িতে থেকেছে, ছেলেবেলায় ঠিকঠাক শিক্ষা পেয়েছে, হাত-খরচের পয়সায় সিনেমা-থিয়েটার দেখেছে, পার্কে কিংবা গড়ের মাঠে প্রেম করেছে মার্জিত, শিক্ষিত পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে, আর কোনও না-কোনও দিন মুখ বেঁকিয়ে বলেছে নিশ্চয়ই, এই রিফিউজিগুলোর জন্যই এমন সুন্দর কলকাতা শহরটা দেখতে দেখতে একেবারে যা-তা হয়ে গেল!

অথচ গৌরহালদারও তো প্রায় একইরকম পরিবারের সন্তান, তাদেরও পাকা বাড়ি ছিল, গোয়ালে গরু, পুকুরে মাছ আর জমিতে ধান ছিল। সেসব কিছু থেকে বিতাড়িত হয়ে এসে থাকতে হয়েছে শহরতলির বস্তিতে। ক্যাশ ডোলের জন্য সরকারি অফিসারদের পা ধরতে হয়েছে, ঘুষ দিতে হয়েছে, এমন ইস্কুলে পড়তে হয়েছে, যেখানে পড়াশুনো কিছু হয় না, কলেজে পরীক্ষার সময় ফি জোগাড় করতে না পেরে ভিক্ষে করতে হয়েছে বড়লোকদের কাছে, অভাবের তাড়নায় বাড়ির একটা মেয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে বেশ্যা হয়েছে। এসব কার দোষে?

তা গৌরবাবু, কেমন আছেন? ভাল আছেন তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার মাঝে খুব জ্বর হয়েছিল শুনলাম।

সেখবরও পেয়েছেন! আপনারা পুলিশের লোক, সব খবর রাখেন।

আপনি বিখ্যাত লোক, আপনার সব খবর এ তল্লাটে ছড়িয়ে পড়ে। আপনার ছেলে ডাক্তারিতে ভর্তি হয়েছে?

এখনও সিলেকশান হয়নি। তা গৌরবাবু, এসেছিলুম একটা বিশেষ কাজে।

কাজ ছাড়া আর কেন আসবেন। আমাদের যত চোরাছ্যাঁচোড় নিয়ে কারবার, আপনাদের মতো মানী লোকের পায়ের ধুলো তো সহজে পড়ে না। আপনাদের ওখানে অ্যানুয়াল ফাংশান কবে হচ্ছে এবারে?

সামনের মাসে। আপনাদের যেতে হবে কিন্তু।

যাব, নিশ্চয়ই যাব।

আপনার কাছে এসেছিলুম একটা দরকারে একটা ক্লেইম কেসের ব্যাপারে।

বলুন! আপনি নিজে এলেন কেন, লোক পাঠালেই হত।

নাজনেখালির মনোরঞ্জন খাঁড়া নামে একটি ছেলে...।

গৌর হালদার উঠে গিয়ে পাশের টেবিলে খোঁজাখুঁজি করে একটা ফাইল নিয়ে এলেন, সেটা খুলে মনোযোগ দিয়ে পড়বার ভান করলেন, যেন তিনি কিছুই জানেন না।

একবার মুখ তুলে বললেন, নিন, চা খান, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ডাবের জল আসছে। তারপর একটু বাদে তিনি আবার বললেন, হ্যাঁ, আপনার স্ত্রীর পাঠানো একটা দরখাস্ত রয়েছে দেখছি।

ফরচুনেটলি, বুঝলেন গৌরবাবু, ওদের নামে গ্রুপ ইনসিওরেন্স করানো ছিল, ওর বাড়ির লোক...।

বাঃ, তবে তো ভালই।

সরকারও এই সব কেসে কিছু টাকা দেবে বলে ঘোষণা করেছে।

হ্যাঁ, আমার কাছে সাকুলার এসেছে।

এখন আপনার কাছ থেকে একটা রিপোর্ট পেলেই...।

কোন ফরেস্ট গিয়েছিল বললেন?

তিন নম্বর ব্লকে।

আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?

দুজনে চোখাচোখি হল। বুদ্ধির লড়াই এবার আসন্ন।

পরিমল মাস্টার জানে, এক সঙ্গে অনেকগুলো কাজে হাত দিলে কোনওটাই ঠিক মতো হয় না। স্থানীয় ওসি যদি ঘুষখোর হয়, ফরেস্টবাবু যদি হয় অত্যাচারী, কোনও ব্যবসায়ী হয় অসাধু, এদের সবাইকে সরিয়ে দেওয়া কিংবা সব অভিযোগের প্রতিকার করার সাধ্য তার নেই। মাত্র কাছাকাছি দশখানা গ্রাম নিয়ে তাদের প্রজেক্ট। ভূমিহীন কিংবা সামান্য জমির মালিক চাষিদের স্বাবলম্বী করে তোলা এবং তাদের অধিকারবোধ সম্বন্ধে সচেতন করাই আপাতত তার কাজ। এইটুকু হলেই যথেষ্ট। এইটুকু নয়, এটাই বিরাট ব্যাপার।

ওসি গৌর হালদারের ভাল আর মন্দ, দু'রকম ব্যবহারের কথাই শুনেছে পরিমল। লোকটির চরিত্রে বৈপরীত্যের ব্যাপারটা সে বুঝেছে, যদিও আসল কারণটা জানে না। এবং এ লোকটিকে সে ঘাঁটাতেও চায়নি, তার কাজে বাধা না দিলেই হল।

ফরেস্টের জয়নন্দনবাবু ঘুরে এসে রিপোর্ট দিয়েছেন।

কোথায় ঘুরে এসেছেন? সে রিপোর্টের কোনও কপি তো আমি পাইনি?

উনি তিন নম্বর ব্লকে গিয়েছিলেন। রাইটার্স বিল্ডিংসে নোট পাঠিয়েছেন শুনেছি।

রাইটার্স বিল্ডিংস? ও? তিনি তিন নম্বর ব্লক ঘরে কী দেখলেন? সেখানে বাঘ আছে, না নেই? সেখানে বাঘের কোনও প্রমাণ পেয়েছেন?

না, বাঘের কোনও প্রমাণ পাননি। তারপর ক'টা জোয়ার ভাটা গেছে, বৃষ্টিও পড়েছে।

জয়নন্দনবাবু তিন নম্বর ব্লকে বাঘের কোনও প্রমাণ দেখতে পেলেন না, পাবার কথাও নয়। সেখানে বাঘ কেন, একটা শেয়ালও নেই, আর সেখানে একটা তাগড়া লোক বাঘের পেটে চলে গেল?

দয়াপুরে যে বাঘ এসেছিল, কোনও দিন কি কেউ ভেবেছে যে দয়াপুরে বাঘ আসতে পারে?

না, কেউ ভাবেনি। যেখানে বাঘ নেই, সেখানে বাঘ এসেছে শুনলেই লোকে বিশ্বাস করবে কেন? তবে দয়াপুরের বাঘটিকে অনেক লোক চোখে দেখেছে, একটি ছোট মেয়েকে বাঘটা মেরেছে, আমি গিয়ে সেই মেয়েটির লাশ দেখেছি, তারপর বিশ্বাস করেছি।

ওখানেও অনেকে দেখেছে।

আপনি নিজে লাশ দেখেছেন?

না।

জয়নন্দন ঘোষাল বা অন্য কেউ সে লাশ দেখেছে?

তা ঠিক জানি না। বোধহয় লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

লাশটা কোথায় গেল? আমি তো যত দূর জানি, বাঘ যাকে ধরে, তার সবটা খায় না, দেহের বিশেষ বিশেষ জায়গার মাংস খেয়ে চলে যায়। লোকটার জামাকাপড়ই-বা গেল কোথায়?

গেঞ্জিটা পাওয়া গেছে।

বটে? শুধু গেঞ্জি?

তাই তো শুনেছি।

সেটা ফরেনসিক টেস্টের জন্য পাঠাতে হবে না? আমি তো দেখিনি সে গেঞ্জি।

তা হলে গেঞ্জিটা চেয়ে পাঠাতে হয়। আবার অনেক দেরি হয়ে যাবে।

দেরি? হ্যাঁ, তা দেরি তো হবে। মনোরঞ্জন খাঁড়ার বাড়িতে কে কে আছে? তার বউ আছে না?

হ্যাঁ, একেবারে কচি মেয়ে, সবে মাত্র বিয়ে হয়েছে।

তাকে আনা হয়নি?

তাকে কি থানায় আনার খুব দরকার? এখন শোকের সময়।

ছেলেটার বাপ কোথায়? সে-ও আসেনি। শুধু আপনি এসেছেন তদ্বির করতে? বুঝলাম।

আপনার রিপোর্টের ওপরই সব নির্ভর করছে। আপনি ফেভারেবল রিপোর্ট দিলে বিধবা মেয়েটা, ওই ছেলেটোর বাপ-মা টাকা পেতে পারে।

অর্থাৎ আর বুদ্ধির খেলা নয়, এবার হৃদয়ের কাছে আবেদন।

একটা সিগারেট টানার জন্য মুখ শুল শুল করছে পরিমলমাস্টারের। চারদিন একটাও সিগারেট খায়নি, তবু নেশাটা কিছুতে ছাড়ে না। এই রকম সময় খুব বেশি প্রয়োজন হয়।

গৌরহালদার বিড়ি-সিগারেট কিছু খান না। পাশের টেবিলে সাব-ইন্সপেক্টর অবিনাশ ফুঁক ফুঁক করে একটা সিগারেট টানছে। সেই ধোঁয়াতেই আরও আনচান করছে পরিমল

মাস্টারের মন। অথচ মুখ ফুটে চাওয়াও যায় না। অবিনাশের সামনের চেয়ারে বসে আছে দুটি বাইরের ছোকরা। ওরা বন বাণী নামে চার পৃষ্ঠার একটি নিউজ প্রিন্টে ছাপা পত্রিকা বার করে। কান খাড়া করে ওরা শুনছে সব কথা।

ঘটনাটা ঘটল কবে যেন, আট তারিখে? আর আমার কাছে একখানা শুধু দরখাস্ত পৌঁছল সতেরো তারিখে। অথচ এর মধ্যে থানায় একটা রিপোর্ট নয়, কিছু না। আমাকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিলে আমি সরেজমিনে দেখে আসতে পারতাম না?

সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে পরিমল মাস্টার এবার বিনীত ভাবে বলল, সত্যিই, আপনাকে আরও অনেক আগেই খবর দেওয়া উচিত ছিল। এটা ভুল হয়ে গেছে খুবই, আর একটা ব্যাপার হল কি জানেন, আমিও তখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলুম।

গৌর হালদার আবার চোখ কুচকোলেন। অর্থাৎ পরিমল মাস্টার বলতে চায়, ওর অসুখ না থাকলেই ওসব ব্যবস্থা ঠিকঠাক করে দিত। সব দায়িত্ব ওর, ও একাই সব গরিবদের মহান মুক্তিদাতা, কত দরদ! মরিচঝাঁপির অসহায় লোকগুলোর ঘর জ্বালিয়ে যখন মেরে তাড়ানো হল, তখন এই দরদ কোথায় ছিল পরিমলমাস্টারের? এরা শুধু নিজের লোকদের স্বার্থ দেখে।

আচ্ছা ধরুন মাস্টারমশাই, কোনও লোক যদি বলে, সে মনোরঞ্জন খাঁড়াকে বসিরহাট বাজারে দেখেছে।

একটু অন্য মনস্ক হয়ে গিয়েছিল পরিমল, চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, কী বললেন?

ধরুন, কেউ যদি বলে ওই ছেলেটাকে কেউ বসিরহাট বাজারে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে, তা হলে কী হবে? জঙ্গলে যাবার নাম করে কেউ যদি কিছু দিনের জন্য অন্য কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে, আর তার স্যাঙাতরা রটিয়ে দেয় যে তাকে বাঘে নিয়ে গেছে? আমি লাশ দেখলাম না, কিছুনা, টাইগার-ভিকটিম বলে রিপোর্ট দিয়ে দিলাম, তারপর সে লোক সত্যি না মরলে আমার চাকরি থাকবে?

পরিমল মাস্টার স্তম্ভিত ভাবে বলল, তা কখনও হয়?

বন-বাণী পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় গৌর হালদারের এই শেষের যুক্তিটা লুফে নিল। অবিকল সেই কথাগুলিই ছাপা হল তাদের কাগজে। লোকে বলাবলি করতে লাগল, মনোরঞ্জন খাঁড়াকে নাকি বসিরহাট বাজারে দেখা গেছে? কে দেখেছে? দেখেছে নিশ্চয়ই কেউ, নইলে দারোগাবাবু ও কথা বলবেন কেন?

থানার রিপোর্ট না পেয়ে ইনসিওরেন্স দফতর বেগড়বাঁই করতে লাগল। সরকারি বিভাগও চুপচাপ। অনেক চেষ্টা করেও ওসি গৌর হালদারকে নড়ানো গেল না। পরিমল মাস্টারও মনে মনে একটু দুর্বল হয়ে আছে। সে জানে, তিন নম্বর ব্লক আর সাত নম্বর ব্লক জঙ্গলের তফাত। সত্যি কথাটা বলে দেওয়া সম্ভব নয় তার পক্ষেও।

গৌর হালদারের সঙ্গে তর্ক করার মতো জোরালো যুক্তি তার মনে পড়ল না একটাও।

.

কয়েক দিন পরেই আর একটি চমকপ্রদ কাণ্ড হল।

রায়মঙ্গল নদীতে একসঙ্গে বাপ আর ছেলেকে আক্রমণ করেছে বাঘ। তীর থেকে বেশ খানিকটা দূরে নৌকো বেঁধে রাত্রে ঘুমোচ্ছিল ওরা। বাঘ এসেছে সাঁতরে। অন্তত সাত বছরের মধ্যেও ও তল্লাটে বাঘের এমন উপদ্রব হয়নি। বাঘ প্রথমে এসে ধরেছিল ছেলেকে, হঠাৎ ছেলের আর্তনাদ শুনে বাপ ঘুম থেকে উঠেই দিকবিদিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে বাঘের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঘ মাত্র একটি থাবার আঘাতেই তার ঘাড় ভেঙে দিয়েছে। তারপর দুজনেরই দুটি উরুর রাং বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেই বাঘ।

বাপ-ছেলের লাশ নিয়ে আসা হয়েছে গোসাবায়। হাজার লোক ভেঙে পড়েছে তাদের দেখতে। কলকাতা থেকে এসেছে রিপোর্টাররা। পুলিশ ও বনের কর্তারা খুব ব্যস্ত। সেই

রোমহর্ষক কাহিনি ছাপা হল সব কাগজে, তাই নিয়েই সর্বত্র আলোচনা। গত বছর বাঘের পেটে নিহত মানুষের সংখ্যা ছিল তেইশ, এ বছর সে-সংখ্যা এর মধ্যেই চব্বিশ ছাড়িয়ে গেল।

চোখের সামনে টাটকা লাশ, তাজা রোমাঞ্চকর গল্প, তারপর আর মনোরঞ্জন খাঁড়ার নিরামিষ কাহিনি কে মনে রাখতে যায়। প্রমাণের অভাবে নাজনেখালির কেস চাপা পড়ে গেল একেবারে।

দৈবক্রমে, রায়মঙ্গল নদীতে নিহত লোক দুটিই পূর্ববঙ্গীয়। তাদের লাশের সামনে নিথর হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন ওসি গৌর হালদার। মনে মনে তিনি বলে চলেছেন, জানি, শুধু আমাদেরই বাঘে খায়। আমরাই সব জায়গায় মার খাই। কই, এখন তো কোনও পরিমল মাস্টার এল না এদের জন্য দরদ দেখাতে? জানি, জানি, সব জানি, আচ্ছা আমিও দেখে নেব।

.

মাঝ রাতে এক বিবাগি

এমন হয় না কোনও দিন মাধবের।

দেবীপুরের খাঁড়িতে ভাল মাছ পাওয়া যাচ্ছে শুনে সে চলে এসেছিল সে-দিকে। কদিন ধরে সংসারে বড় টান যাচ্ছে। শুধু গায়ের জোর আর মনের জোর দিয়ে সে আর সব দিক সামাল দিতে পারছে না।

কোথায় মাছ, সবলবডঙ্কা। সবাই মিলে জাল ফেলে ফেলে নদী একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে, সামান্য গেঁড়ি-গুগলিও আর ওঠে না। ভাল করে বর্ষা না নামলে আর মাছের কোনও আশা নেই। সেই যে কথায় বলে না, পরের সোনা না দিও কানে, কান যাবেতার

হ্যাঁচকা টানে। এ হল সে-রকম। কে বলল দেবীপুরের কাঁড়িতে মাছ, অমনি সে চলে এল হেদিয়ে। এবার বোঝ ঠ্যালা! ভাটার সময় ফিরতে ফিরতে দেড় দিনের ধাক্কা।

সারা দিন জাল ফেলে ফেলে, কিছুই না পেয়ে, ক্লান্তি ও মনের দুঃখ নিয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল মাধব। নৌকো বাঁধার কথাও খেয়াল হয়নি। মাঝ রাতে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ায় সে জেগে উঠল ধড়মড়িয়ে।

তার দৃষ্টিবিভ্রম হল। সে কোথায়? নদীর দু'ধারের মিশমিশে জঙ্গল, এ তো দেবীপুরের খাঁড়ি নয়। আকাশে যেন কেমন ধারা ছানা কাটা মেঘ, ফ্যাকাশে মতো ভুতুড়ে আলো, নদীর জল উঁচু-নিচু, এ কোন নদী? মাধবের মনে হল সবকিছুই অচেনা।

ছাড়া নৌকো জোয়ারের টানে ভাসতে ভাসতে কোথায় চলে এসেছে, তার ঠিক নেই। শহুরে ফিরিওয়ালো যেমন কখনও রাস্তা-গলিঘুঁজি ভুল করেনা, মাধব মাঝিও সেইরকম এ-দিককার সমস্ত নদীর নাড়ি-নক্ষত্র জানে। কিন্তু সারা দিনের উপোসি পেট ও আধ-ভাঙা ঘুমে সে যেন আজ সব কিছুই ভুলে গেছে। তার মনে হল, এই নদীতে সে আগে কখনও আসেনি, দু'ধারেই সমান জঙ্গল এমন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, এত উঁচু উঁচু গাছ? সুন্দরবনের গাছ তো এত লম্বা হয় না, তবে ওই আকাশঝাড়ু গাছের জঙ্গল কোথা থেকে এল? শোনা যাচ্ছে না তো সেই পরিচিত জলতরঙ্গ পাখির ডাক?

নদী ও জঙ্গল একেবারে নিঃসাড়, কোথাও কোনও আলোর বিন্দু নেই, আর কোনও নৌকোর চিহ্ন নেই, মাধব সম্পূর্ণ একা। মাঝে মাঝে নৌকোয় উঠে দাঁড়িয়ে সে চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখে ঠাহর করবার চেষ্টা করছে। নৌকোটা আপন মনে এগিয়ে যাচ্ছে তরতরিয়ে। হাল ধরার কথাও তার মনে নেই। এ যেন ভরা কোটালের বান।

ভয় পাবার পাত্র নয় মাধব মাঝি, বরং একটা চাপা আনন্দ ছড়িয়ে পড়ছে তার শরীরে সে যেন নতুন একটা নদীপথ আবিষ্কার করেছে, নতুন একটা দেশ, এখানে তার আগে আর কেউ আসেনি।

ও কী, মাধব মাঝি কি পাগল হয়ে গেল? হঠাৎ খ্যাপলা জাল বাঁ কনুইতে বাগিয়ে ধরে সে ছুঁড়ে দিল প্রাণপণ শক্তিতে। মাঝ- নদীতে এইভাবে কেউ জাল ফেলে? তার মতো অভিজ্ঞ লোক কি জানে না যে জালের কাঠি মাটি না ছুঁলে সেখানে জাল ফেলে কোনও লাভ নেই? জোয়ারের সময় নদীর মাঝখানে খুব রকম করেও দশ-মানুষ জল হবে!

সে-সব কথা চিন্তাই করছে না মাধব, এমন কী জাল তোলার পর সে দেখছেও না মাছ উঠল কি না। একবার তুলে পরের বার সে ছুঁড়ছে আরও জোরে, আর কী যেন বলছে বিড় বিড় করে। যেন এই নদীর মাঝখানে কোথাও আছে অতুল সম্পদ। আর কেউ টের পায়নি, মাধব ঠিক তা তুলে নেবে।

মাঝে মাঝে জাল ফেলার ঝপ ঝপ শব্দ। অনৈসর্গিক আলো মেশানো অন্ধকারের মধ্যে এক খ্যাপা জেলে ছুঁতে চাইছে নদীর হৃৎপিণ্ড।

দৈত্যরাও তো ক্লান্ত হয় কখনও কখনও। মাধবমাঝিই-বা কতক্ষণ পারবে। একসময় সে নৌকোর ওপর জাল ছড়িয়ে রেখে বসে পড়ল। তার হাঁটু কখনও এত দুর্বল হয়নি। সে আর দাঁড়াতে পারছে না। হাঁটু দু'টি হাতে জড়িয়ে ধরে সে মাথা গুঁজল। তারপর কাঁদতে শুরু করল একটু পরে।

সংসার যুদ্ধে পর্যদস্ত কোনও বয়স্ক সেনাপতির কান্নার মতো এমন উপযুক্ত, নির্জন জায়গা আর হয় না।

সেইভাবেই সে বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর এক সময় ভোর হয়ে গেল। তখন চোখ তুলে মাধব আবার তাকাল তীরের দিকে। দিনের আলো বড় নির্মম, সব কিছু চিনিয়ে দেয়। মাধব বলল, ও হরি, এ যে দেখি রানি ধোপানির চক। আর দুটো ট্যাঁক ঘুরলেই সেই সাত নম্বর ব্লকের নিষিদ্ধ জঙ্গল।

একটু দূরেই আর একটি নৌকো। আপন মনে ঘুরছে। প্রথমে মনে হল, সে নৌকোতে কোনও মানুষ নেই, কেউ দাঁড় ধরেনি, কেউ হাল ধরেনি! এ কী! মাধব মাঝি স্তম্ভিত!

তারপর ভাল করে চোখ রগড়ে দেখল, নৌকোর ঠিক মাঝখানে হাঁটু গেড়ে বসে আছে এক বৃদ্ধ। মাথার চুল ধপধপে সাদা, মুখে সেই রকম দাড়ি। জানুর ওপর দুটি হাত, চক্ষু দুটি বোজা।

এ লোকটা কে? মাধব মাঝি তো রিফিউজি নয়। সে এসেছে পার্টিশানের আগে। বাদা অঞ্চলের কোন মাঝিকে সে না চেনে? হঠাৎ গা-টা ছম ছম করে উঠল তার।

কিছুক্ষণ লোকটিকে দেখার পর মাধব মাঝি হেঁকে জিজ্ঞেস করল, ও মিঞা সাহেব, আপনি কোনখানে যাবেন?

বৃদ্ধ চোখ মেলে শান্তভাবে মাধবের দিকে তাকালেন। তারপর বলল, আমি কোনওখানে যাব না রে ভাই! তুমি যেখানে যাবে যাও!

আপনি এখানে কী করতাছেন? এ জায়গা তো ভাল না।

শব্দ কোরো না রে ভাই, শব্দ কোরো না। এ সময় আকাশ পরিষ্কার থাকে, মন পরিষ্কার থাকে, এ সময় আল্লাতাল্লা আমার সঙ্গে কথা কন। তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও।

মাধব মাঝি আর কথা না বলে কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল অন্য নৌকোটির দিকে। সেটি যেন নিজে নিজেই চলছে। মাধব মাঝির নৌকো স্থির, তবু ওই নৌকোটা যাচ্ছে কী করে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে কপালে হাত ছোঁয়াল।

তার নিয়তি তাকে এখানে টেনে এনেছে? দেখা যাক তাহলে! নিয়তি ঠাকুরানির সঙ্গে একবার মুখোমুখি হতে চায় মাধব।

জোয়ার স্তিমিত হওয়ায় নৌকোটা থেমে গেছে। মাধব এবার দাঁড় ধরল। প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা সে মুখে একদানা অন্ন দেয়নি। মাটির হাঁড়িতে কয়েক মুঠো চাল আছে, কিন্তু এখন ভাত

ফুটিয়ে নেবার ইচ্ছেও তার নেই। খানিকটা কাঁচা চালই মুখে দিয়ে চিবোতে লাগল। সে ওই সাত নম্বর ব্লকেই যাবে।

ডাঙার কাছে এসে সে সাবধানে অপেক্ষা করল একটুক্ষণ। হাওয়ায় গন্ধ শোঁকে। পাখির কিচির মিচির ছাড়া কোনও শব্দ নেই। যত দূর চোখ যায়, কোথাও কোনও ঝোপঝাড় পড়ে না। বাঁদরের পাল এ-দিকে আসেনি। হঠাৎ দূরে বেশ জোরালো গলায় শোনা গেল কোঁকর কোঁ, কোঁকর কোঁ কোঁ! বন-মোরগ! বন-বিবিকে মানত করে লোকে দেশি মুরগি ছেড়ে দিয়ে যায়, সেগুলোই এক সময় বন মুরগি হয়ে যায়।

ভাটার সময় কাদা-জলে নোঙর ফেলে মাধব নামল নৌকো থেকে। খোলের ভেতর থেকে একটা কুড়ুল সে বার করে নিয়েছে হাতে। শূল বাঁচিয়ে, কাদায় পা টেনে টেনে সে উঠল পাড়ে। প্রথমেই সামনের হেঁতাল-ঝোপটার ওপর মারল কুড়ুলের এক কোপ। কিছুই নেই সেখানে।

তারপর কুড়ুলটা পাশে নামিয়ে রেখে সে হাঁটু গেড়ে বসল মাটিতে। হাত জোড় করে মন্ত্র পড়তে লাগল। সে বন-আটক করবে। এক মাইলের মধ্যে কোনও দক্ষিণরায়ের বাহন থাকলে সে আর নড়াচড়া করতে পারবে না।

প্রথমে সে বিড় বিড় করে উচ্চারণ করল তার গুরুর শেখানো বীজমন্ত্র। তারপর সে চিৎকার করে বলতে লাগল বাঘ-বাঁধনের ছড়া–

এই আঁচির বন্ধন, পাচির বন্ধন, বন্ধন বাঘের পা–
আর শালার বাঘ চলতে পারবে না।
এই আঁচির বন্ধন, পাঁচির বন্ধন, বন্ধন বাঘের চোখ–
এইবার বেটা অন্ধ হোক।
এই হুঁকোর জল, কেঁচোর মাটি
লাগবে বাঘের দাঁত কপাটি।
ছাঁচি কুমড়ো বেড়াল পোড়া

ভাঙরে বাঘের দাঁতের গোড়া।
যদি রে বাঘ নড়িস চড়িস
খ্যাঁকশেয়ালির দিব্যি তোকে।
এনার কাঠি বেনার বোঝা
আমার নাম মাধব ওঝা!

মন্ত্র পড়া শেষ হলে মাধব প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে পরম নির্ভয়ে আতিপাতি করে খুঁজে দেখতে লাগল জঙ্গল। একটা বাঘ আসুক, মাধব একবার মুখোমুখি দেখতে চায় তাকে। সামনাসামনি বাঘকে দেখলে সে বলবে, না শালা নে, পারিস তো আমার জ্বালা যন্তোন্না জুড়াইয়া দে এক্কেবারে। তোরও প্যাটে ক্ষুধা, আমারও প্যাটে ক্ষুধা, হয় তুই মরবি, নয় আমি মরুম।

সাত নম্বর ব্লকের বাঘ চলে গেছে অনেক দূরে। অথবা মাধবকে দেখে ভয়ে কাছে এল না। এ ঘোর জঙ্গলে এক জন একলা মানুষকে জঙ্গলে ঘুরতে দেখলে বাঘেরও ভয় পাবার কথা। সে জানোয়ারেরও তো প্রাণের ভয় আছে।

মাধবের আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, মনোরঞ্জনের লাশের কোনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া। যদিও তার অভিজ্ঞতা থেকে মনে মনে জানে, ঘটনার একুশ দিন পর লাশের চিহ্ন চোখে পড়া খুবই অস্বাভাবিক। বাঘ সবটা খায় না ঠিকই, কিন্তু জোয়ারে এই জঙ্গলের অর্ধেকটা ডুবে যায়। ভাটার সময় যা পায়, নদী টেনে নিয়ে চলে যায়। বাঘ তো বেশি দূর লাশ টেনে নিয়ে যাবে না। খিদের জ্বালায় মারার পরই কাছাকাছি বসে খাবে।

অনেকখানি বন তন্ন তন্ন করে খুঁজেও মাধব বাঘ কিংবা লাশের কোনও চিহ্ন খুঁজে পেল না। তখন সে খুব মন দিয়ে একটা বড় গরাণ গাছ কাটতে লাগল। একা পুরো গাছটা কেটে, খণ্ড খণ্ড করে ডালপালা ছাড়িয়ে নিতেও তার কম সময় লাগল না। তার মন একেবারে শান্ত, বাঘ কিংবা বনরক্ষী কিংবা পুলিশের কোনও রকম আশঙ্কাই সে করছে না।

কাঠগুলো নৌকোয় তুলতে গিয়ে এক সময় সে দেখতে পেল, কাদার মধ্যে গাঁথা সাদা পাথরের মতো কী একটা জিনিস। গোটা সুন্দরবনে পাথরের কোনও অস্তিত্ব নেই। কৌতূহলী হয়ে সে জিনিসটাকে টেনে তুলতে গেল।

সেটি একটি নর-করোটি। মাংস-চামড়া চুল সমস্ত উঠে গিয়ে খুলিটা সাদা হয়ে গেছে। এই কি মনোরঞ্জন? হতেও পারে। না হতেও পারে। না হওয়াই সম্ভব, মনে হয় আরও বেশি দিনের পুরনো।

তবু মাধব ধরে নিল, এটা মনোরঞ্জনের খুলি। সে অনেকখানি স্বস্তি পেল। এবার সে গাছের একটা সরু ডাল পুঁতে দিল মাটিতে। নৌকো থেকে তার গামছাটা এনে, তার আধখানা ছিঁড়ে পতাকার মতো বেঁধে দিল সেই ডালে এবং মন্ত্র পড়ে দিল মনোরঞ্জনের নামে। সে গুণিন, অকুস্থলে সে নিহত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশে যদি একটা ধ্বজা পুঁতে দিতে না পারে, তা হলে তার ধর্মের হানি হয়! তবে কি তার গুরু শিবচন্দ্র হাজরাই এই উদ্দেশ্যে নিয়তির ছদ্মবেশ ধরে নৌকোটা টেনে এনেছেন এই সাত নম্বর ব্লকে?

কাঠগুলো নৌকোতে বোঝাই করে মাথার খুলিটাও মাধব নিয়ে নিল নিজের সঙ্গে। পুলিশের দারোগাই বলল, আর গবর্নমেন্টই বলল, কেউ এই খুলিটা দেখে বিশ্বাস করবে না যে, মনোরঞ্জন খাঁড়াকে বাঘে খেয়েছে। এই তার প্রমাণ। এর আগেও কত লোককে বাঘে খেয়েছে। তাছাড়া নদীতে ভাসতে ভাসতে কত মড়া আসে, ভাটার সময় কাদায় আটকে যায়। এরকম মাথার খুলি গণ্ডায় গণ্ডায় পাওয়া যেতে পারে। তবু একা অনেক দূরের পথ ফিরতে হবে, এই খুলিটাই মাধবের সঙ্গী।

বেলা গড়িয়ে এসেছে, আকাশটা লালে লাল। পাখির ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে নদীর এপার থেকে ও-পারে। পৃথিবীটাকে এই সময় কী সুন্দর, শান্তিময় মনে হয়।

আশ্চর্য, এখনও এই নদীতে আর একটা নৌকোও কিংবা পেট্রোলের লঞ্চ দেখা গেল না। প্রায় দু-আড়াই দিন হয়ে গেল, মাধব কারুর সঙ্গে একটিও মন খুলে কথা বলেনি।

শুকনো লকড়ি, পাতা কিছু জড়ো করে এনেছিল মাধব, তাই দিয়ে তোলা উনুনে আগুন জ্বালাল। মিষ্টি জল নেই সঙ্গে, নদীর নোনা জল এত নোনা যে তা মুখে তোলা যায় না, বমি আসে। এই জল দিয়ে ভাত রাঁধলেও কেমন যেন অখাদ্য হয়। তবু কী আর করা যাবে। দু'মুঠো ভাত না খেয়ে মাধব আর পারছে না।

জোয়ার আর ভাটার ঠিক মাঝামাঝি সময়টায় নদী যেন একেবারে থেমে থাকে। এই সময় আর নৌকো চালাবার মতো তাগদ মাধবের নেই। অত্যন্ত নোতা আর হড়হড়ে খানিকটা ভাত খেয়ে তার শরীরটা আরও অবসন্ন লাগছে। শুধু হালটা ধরে সে বসে রইল। অন্ধকার নেমে এসেছে অনেকক্ষণ। নদীর দু'ধারের দৃশ্য আবার অচেনা। শেষ বিকেলে যে অত রঙ ছিল আকাশে, সেসব কোথায় গেল? এখন শুধু ময়লা ময়লা মেঘ। তবে আজ ডান পাশের জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে একটা জলতরঙ্গ পাখির ডাক। ট-র-র-র, ট-র-র-রাট- র- র- র।

ঝুপসি অন্ধকারের মধ্যে, থেমে থাকা নৌকোয় অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পর মাধব কথা বলতে শুরু করল।

অ মনো, মনো রে! তুই শুনতে পাস আমার কথা?

সাদা রঙের মাথার খুলিটা ঠিক মাধবের সামনে পাটাতনের ওপর বসানো চোখ দুটোর জায়গায় দুটো কালো গর্ত। তবু যেন সে মাধবের দিকেই তাকিয়ে আছে।

অ মনো, চাইয়া দ্যাখ, আমি মাধবদা। অমন সোন্দর মুখখান আছিল তোর, কার্তিক ঠাকুরের মত টানা টানা চক্ষু। হায় রে, সব কোথায় গেল। মরলে সব মানুষই সমান, আমি মরলে আমার মাথাডাও এই রকমই হইয়া যাবে। আমার মাথার খুলি, তোর মাথার খুলি, মাইয়া মানুষের খুলি, সবই এক। ক্যান তুই আইলি আমাগো সাথে। ঘরে নতুন বিয়া করা বউ।

ফিন ফিন করে বাতাস বইছে। আজ আবার একটু পরেই বোধহয় বৃষ্টি আসবে।

হ্যামলেট নামের প্রসিদ্ধ নাটকটির কথা তো কিছুই জানে না মাধব। জানলে বোধহয় সে সেই অর্ধোম্মাদ রাজকুমারের অনুকরণ করত না।

সইত্য কথা ক তো, মনো তোর প্রাণডা কি পেরথম ঝটকাতেই ব্যায়রাইয়া গেছিল? কষ্ট পাসনাই তো? নাকি লড়ছিলি? অইন্তত একখান কোপও মারছিলি সে সুম্বুন্ধির ভাইডার মাথায়? তোরে আমরা অনেক বিছরাইছিলাম, বিশ্বাস কর মনো, খোঁজার আর কিছু বাকি রাখি নাই, তোরে একেবারে ঝড়ে উড়াইয়া নিয়া গেল? সে সুম্বুন্ধির ভাইরে একবার সামনে পাইলে...। বিড়ি খাবি, মনো? আমি একটা খাই? আর দুই খান মাত্তর বিড়ি আছে, কত দূরের পথ।

উনুনের আঁচ এখনও নেবেনি, দেশলাই খরচ না করে সেখান থেকেই বিড়িটা ধরাল মাধব। কাল রাতে বৃষ্টি ভেজায় বিড়িটা স্যাঁতসেতে হয়ে গেছে। এই রকম স্যাঁতসেতে বিড় টানার যে কী যন্তোন্না, তা শুধু ভুক্তভুগীই বুঝবে! হে ভগবান, এইটুকু সুখও কি দেবে না।

অ মনো, কথা কস না কেন? অমন দম ফাটাইন্যা গলার আওয়াজ আছিল তোর! ‘বঙ্গে বর্গী’ পালায় ভাস্কর পণ্ডিত তুই বড় ভাল করছিল, জয়হিন্দ ক্লাব এবার একেবারে কানা। অশ্বিনী চাইল্যা গেল, তুইও গেলি। দূর শালা।

বিরক্ত হয়ে নিবে যাওয়া বিড়িটা মাধব ছুঁড়ে ফেলে দিল জলে। তারপর সে একটি উন্মাদের মতো কাণ্ড করল।

মাথার খুলিটা হাতে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর সেই জনমানবশূন্য নদী ও জঙ্গলের মধ্যে গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচাতে লাগল, শোনো, শুইন্যা রাখো তোমরা, আমি মাধব দাসমজুমদার, আমার বাপে আমারে খেদাইয়া দিছিল। মায়রে চোক্ষে দেখি নাই, তবুও আমি এ-জন্মে কক্ষনও চুরি করি নাই, ডাকাতি করি নাই, কাউর কোনও ক্ষতি করি নাই। নিজের বউ ছাওয়ালপানগো দুই মুঠা ভাত দেবার জইন্যে রোজ মাথার ঘাম পায়ে ফেলি। তাই তোমরা আমারে একটা বিড়ি পর্যন্ত মনের সুখে টাইনতে দেবা না? তোমরা ভাবছ

কী? আমি মাধব দাসমজুমদার, আইজও মরি নাই। আমি মরব না। আমি হাজার বছর বাঁইচ্যা থাকম, আমারে মারতে পারবা না। আমারে এই রকম সাদা ফ্যাকফ্যাকে খুলি বানাইতে পারবা না। আমি লইড়া যামু। আয়, কে আসবি আয়। কে কোথায় আছোস আয়।

জোয়ার-ভাটা, ঢেউ ও ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে যুঝে মাধব মাঝি ছোট মোল্লাখালি এসে পৌঁছল তৃতীয় দিন সন্ধ্যায়। সারা শরীর জলকাদা মাখা। পেটটা যেন ঠেকে গেছেপিঠে। শুধু জ্বল জ্বল করছে দুটি চোখ।

এ-দিকে ছোট মোল্লাখালিতে দারুণ হই চই, প্রচুর হ্যাজাক ও লণ্ঠনের আলো, তিনখানা লঞ্চ ও গোটা বিশেক নৌকো ভিড়ে আছে ঘাটে। পুলিশ ও বন-বিভাগের লঞ্চ একনজরে দেখেই চিনেছে মাধব, একবার সে ভাবল, সরে পড়বে এখান থেকে। কিন্তু তার শরীর আর বইছে না। লোকালয় দেখার পর আর সে একলা একলা জলে ভাসতে পারবে না। যা হয় হোক।

নৌকো বেঁধে ওপরে উঠে আসবার পর সে দেখল, ব্যাপার একেবারে অন্য রকম।

নদী সাঁতরে এপারে চলে এসেছে এক বাঘিনি। আজু শেখের বাড়িতে এসে একটা গোরু মেরেছে। কিন্তু পালাতে পারেনি শিকার নিয়ে। অতিরিক্ত দুঃসাহসের জন্যই হোক বা খিদের জ্বালাতেই হোক, বাঘ সেখানেই গোরুটাকে খেতে শুরু করেছিল। লোকজন উঠে পড়ায় সকলের তাড়া খেয়ে সে রান্নাঘরে ঢুকে বসে আছে।

সকাল থেকে প্রায় হাজার খানেক লোক ঘিরে রেখেছে আজু শেখের বাড়ি। নরখাদক বাঘই আবার সব চেয়ে বেশি ভয় পায় মানুষকেই। সেই বাঘিনি আর কিছুতেই বেরুচ্ছেনা রান্নাঘর থেকে দূর দূর গ্রাম থেকে লোকজন ছুটে এসেছে বাঘ দেখতে। কারুর প্রাণে যেন ভয়-ডর নেই। সবাই চায় বাঘ বাইরে বেরিয়ে আসুক, দু'চোখ ভরে, প্রাণ ভরে দেখে নেওয়া যাক। সুন্দরবনের মানুষ প্রার কেউই কখনও জীবন্ত বাঘ দেখেনি। যে-দেখেছে, সে সচরাচর ফিরে আসে না সে-ঘটনা বলার জন্য।

খবর পেয়ে তড়িঘড়ি পুলিশ ও বনবিভাগের লোকও চলে এসেছে। বাঘটাকে রান্নাঘর থেকে কিছুতেই বার করতে পাবছে না কেউ। দর্শকরা মাঝে মধ্যে ইট-কাঠ ছুঁড়ে মারে, পটকাও ফাটানো হয়েছে দুটো, তাতে বাঘ আরও ভয় পেয়ে গেছে। এ পর্যন্ত টুঁ শব্দটি করেনি। কিন্তু সেটা যে রান্নাঘরের মধ্যে রয়েছে, তা বোঝা যায়। চ্যাঁচার বেড়ার ফাঁক দিয়ে একটু একটু দেখা যায় কালো-হলুদ ডোরাকাটার ঝিলিক।

বাঘকে মারার হুকুম নেই। গোসাবা বাঘ প্রকল্পে খবর গেছে। সেখান থেকে তাদের দ্রুতগামী স্পিড বোটে আসছে ঘুমের ওষুধের টোটা। সেই টোটা দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে বাঘকে নিয়ে যাওয়া হবে খাতির করে।

ওসি গৌর হালদার একবার এসে ঘুরে গেছেন। বনবিভাগ এবং টাইগার প্রজেক্ট যখন ভার নিয়েছে, তখন আর তাঁর করবার কিছু নেই। বাঘের বদলে যদি ডাকাত পড়ত আজু শেখের বাড়িতে, তাহলে তিনিই হতেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। বাঘে গোরু মেরেছে। মানুষ তো মারেনি, সুতরাং কিছু রিপোর্টও দেবার নেই তার।

ভিড়ের ফাঁক-ফোকর গলে একেবারে সামনে দিকে এসে দাঁড়িয়েছে মাধব মাঝি। অপরিচ্ছন্ন, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, জলে ভেজা শরীর, তবু উত্তেজনায় ধক ধক করছে তার বুক। এই বাঘিনিটাই কি মেরেছে মনোরঞ্জনকে? না, তা হতে পারে না, সেই সাত নম্বর ব্লক থেকে এত দূর ছোট মোল্লাখালিতে বাঘ আসবে কী করে? তবু বাঘ তো।

সাধুচরণ, নিরাপদ, বিদ্যুৎরা এসেছে কি না খুঁজবার চেষ্টা কবল সে একবার। কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে কিছু বুঝবার উপায় নেই। হঠাৎ তার মনে হল, মনোরঞ্জন যেন দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে। এক মাস আগে হলেও, এমন খবর পেলে মনোরঞ্জন ঠিক ছুটে চলে আসত দেখবার জন্য। এখনও সে আসবে না? শরীরে একটা তরঙ্গ খেলে গেল মাধবের।

ঘুমের টোটা এসে পৌঁছবার আগেই ঘটনার গতি গেল অন্য দিকে। ছোট মোল্লাখালির এক দল লোক দাবি তুলল, তারা বাঘকে নিয়ে যেতে দেবে না কিছুতেই। বাঘ এসে

তাদের গাঁয়ের মানুষ মারবে, গোরু মারবে আর বাবুরা এসে সেই বাঘকে ঘুম পাড়িয়ে আদর করে নিয়ে যাবে? পুলিশ ও ফরেস্ট গার্ডদের ঘিরে ফেলে তার বলল, হয় বাঘ মারো, নয় আমাদের মারো। বনবিভাগের নিরীহ বড়বাবু জয়নন্দন ঘোষাল হ্যাঁ কিংবা না কোনওটাই বলতে পারলেন না, মুখ আমসি করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তখন উত্তেজিত জনতা জয়নন্দন ঘোষালকে বেঁধে ফেলল একটা খুঁটির সঙ্গে। বাঘ মারা নাহলে তাঁকে ছাড়া হবে না। পুলিশ ও ফরেস্ট গার্ডরা বুঝল যে ব্যাপার বে-গতিক, বাঘের বদলে মানুষ মারার ঝুঁকি তারা নিতে পারে না। এদিকে লোকজন যা খেপে উঠেছে, এরপর তাদের প্রাণ নিয়েই টানাটানি।

পুলিশ ও ফরেস্ট গার্ডদের মোট তিনটি বন্দুক, বিশেষ এক জনের ওপর যাতে দায়িত্ব না পড়ে সেই জন্য তিন জনই এক সঙ্গে বন্দুক উঁচিয়ে ধরল আজু শেখের রান্নাঘরের দিকে। কোনও রকম লড়াই দেবার চেষ্টা করল না বাঘটা, ভিতুর ডিম হয়ে নিঃশব্দে বসে আছে রান্নাঘরে।

গুড়ুম। গুড়ুম। গুড়ুম। আঃ কী মিষ্টি আওয়াজ।

দ্বিতীয় গুলিটা খেয়েই বাঘটা রান্নাঘরের চ্যাঁচার বেড়া ভেঙে এক লাফ দিয়ে পড়ল এসে উঠোনে। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে নিঃস্পন্দ।

কী সুন্দর চেহারা সেই বাঘিনিটার, কী অপূর্ব শরীরের গড়ন, যেন কোনও শিল্পীর সৃষ্টি। হাত আর পা দুটো ছড়িয়ে শুয়ে আছে লম্বা হয়ে, মুখে একটা কাতর ভাব।

লোকজন সরে গিয়েছিল অনেক দূরে। মাধবই চেঁচিয়ে উঠল, মার, মার, মার, সুম্বুন্ধির পুতকে মার।

আবার সবাই ছুটে এল সে-দিকে। হাতের কুড়ুলটা দিয়ে সেই সদ্য মৃত বাঘিনির ওপর কোপের পর কোপ মেরে যেতে লাগল মাধব। তারপর অন্যদের ধাক্কাধাক্কিতে এক সময় সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ওই ছিন্নভিন্ন ব্যাঘ্র-শরীরে।

.

ইচ্ছাপূরণ

বছর ঘুরে গেছে। আবার এসেছে ফাল্গুন মাস, এসেছে আকালের দিন। নদীর ধারে বাঁধের ওপর উবু হয়ে বসে থাকতে দেখা যায় জোয়ান-মন্দ মানুষদের। হাতে কোনও কাজ নেই, ঘরে খোরাকির ধান ফুরিয়ে আসছে। আবার জঙ্গলে কাঠ কাটতে যাবার জন্য উসখুস করছে ছোকরাদের মন।

নিশ্চয়ই জঙ্গল থেকে চোরাই কাঠ নিয়ে নিরাপদে ফিরেও আসছে অনেকে। নইলে আর মহাদেব মিস্তিরির ব্যবসা চলছে কী করে? এই সময়টাতেই তার কারবার ফেঁপে ওঠে, তার বাড়ির সামনে জমে ওঠে কাঠের পাহাড়। দিনমজুরি হিসেবে মাধব মাঝিকে কাঠ ওজন করার একটা চাকরি দিয়েছে মহাদেব, মাছ ধরা ছেড়ে সে এখন ওই কাজ করে। প্রায়ই মাধব ভাবে, বউ-বাচ্চাদের নিয়ে এই বাদা অঞ্চল ছেড়ে সে অন্য কোথাও চলে যাবে। কোথায় যে সাবে, সেটাই জানে না।

দু-দশ জন ঘনিষ্ঠ লোক ছাড়া মনোরঞ্জনের কথা আর কেউ মনে রাখেনি। মৃত মানুষকে নিয়ে বেশি দিন হা-হুতাশ করা এ-দিককার নিয়ম নয়। যে গেছে সে তো গেছেই, যারা আছে, তারাই নিজেদের ঠ্যালা সামলাতে অস্থির।

শূন্য হাটখোলায় বসে দুপুরের দিকে তাস পেটায় সাধুচরণ, নিরাপদ, বিদ্যুৎ আর সুভাষরা। আবার কোনও একটা যাত্রাপালার মহড়া শুরু করার কথা মাঝে মাঝে ভাবে। ‘মাটি আমার মা’ নামে একটা আধুনিক পালা ওদের খুব মনে ধরেছে, কিন্তু তার নায়কের

মুখে গান আছে। তখন মনে পড়ে মনোরঞ্জনের কথা। বেশ ভাল গানের গলা ছিল মনোরঞ্জনের, ওর জায়গা আর কেউ নিতে পারবে না।

তাস খেলতে খেলতে সাধুচরণ মাঝে মাঝে অন্য রকম কড়া চোখে তাকায় মোটা সুভাষের দিকে। এ দৃষ্টির মানে আছে। সুভাষ চোখ নামিয়ে নেয়।

পরিমল মাস্টার কথা রেখেছিল, সাধুচরণকে তাঁর ইস্কুলে একটা কাজ দিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু সাধুচরণ সে-চাকরি রাখতে পারেনি। অতবড় একটা জোয়ান শরীর নিয়ে সে ইস্কুলের দফতরির ভূমিকায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারল না। মাঠের জল কাদা ভেঙে হাল চষা, চড়চড়ে রোদে নৌকো নিয়ে মাছ ধরা কিংবা আট টাকা রোজে সারা দিন কারুর বাড়িতে মাটি কাটায় সে অভ্যস্ত, দেহের ঘাম না ঝরলে কাজকে সে কাজ বলেই মনে করে না। তাছাড়া, রোজ সাত মাইল ভেঙে সে জয়মণিপুরে চাকরি করতে যাবে, তাহলে তার নিজের চার বিঘে জমি কে চাষ করবে? গোটা সংসার তুলে নিয়ে গিয়ে জয়মণিপুরে থাকাও তার পক্ষে সম্ভব নয়, মাইনের একটা টাকায় সে তাদের কী খাওয়াবে?

মাথা গরম সাধুচরণের, ইস্কুলের এক মাস্টারের ওপর রেগে এক দিন মারতে উঠেছিল। শহর থেকে আসা মাস্টারবাবুটি তুই তুই বলে ডাকতেন। প্রথম দিন থেকেই তাকে অপছন্দ করেছিল সাধুচরণ। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোক বলে, এ-দিককার চাষিরাও মাঠে পরস্পরকে আপনি বলে। মাস্টারবাবুটির ঘাড় চেপে ধরেছিল এক দিন, সেই অপরাধেই সাধুচরণের চাকরি গেল।

চাকরিটি হারিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সাধুচরণের তেমন ক্ষতি হয়নি, বরং লাভই হয়েছিল। তখনই বাগদা-পোনার হুজুক উঠল। বছরের বিশেষ একটা সময়ে এই সব নদীর দু'ধার দিয়ে বাগদা চিংড়ির বাচ্চারা ভেসে যায়। প্রায় স্বচ্ছ, সরু আলপিনের মতো তাদের চেহারা, খালি চোখে প্রায় বোঝাই যায় না। হাজার হাজার বছর ধরেই তারা নিশ্চয়ই ভেসে যাচ্ছে, এত দিন কেউ লক্ষ্য করেনি। এখন বাগদা চিংড়ির দাম প্রায় সোনার মতো, সাহেবরা খায়, তাই ভেড়ির মালিকরা ওই বাগদা-পোনার অস্তিত্ব আবিষ্কার করে লাগিয়ে

দিল গ্রামের লোকদের। ছেলে-মেয়ে-বুড়ো-মন্দা কেউ আর বাকি রইল না, সবাই নেমে পড়ল নাইলনের জাল নিয়ে। সেই সময়টায় সাধুচরণ এবং তার বন্ধুরা দিনে প্রায় পঁচিশ তিরিশ টাকা পর্যন্ত রোজগার করেছে। সেই কয়েকটা দিন বড় সুদিন গেছে।

সন্ধেবেলা মাঠে গিয়েছিল বাসনা, তারপর মহাদেব মিস্তিরির পুকুর থেকে গা হাত-পা ধুয়ে ফেরবার সময় হঠাৎ ভয় পেয়ে বলল, কে? কে?

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল কেউ নেই। অথচ সে স্পষ্ট পায়ের শব্দ শুনেছিল।

অন্ধকার হয়ে গেছে, এখানে খানিকটা বাগান মতো পেরিয়ে তারপর ওদের বাড়ি। ভয় পায়নি বাসনা। বন-বিড়ালির মতো শরীরে রোঁয়া ফুলিয়ে একটু বেঁকে দাঁড়িয়ে রইল। একটু ক্ষণের মধ্যেও কেউ এল না দেখে সে বলল, মরণ! কোন মুখপোড়া, একবার আয় না দেখি সামনে।

ভিজে কাপড়ে সপসপ করে বাসনা ফিরে এল বাড়িতে। শরীরে গোলগাল ভাবটি খসে গিয়ে এখন তার বেশ ফুরফুরে চেহারা।

শোওয়ার ঘরের দাওয়া থেকে ডলি বলল, ওই এলেন নবাবের বেটি! বলি, ও-বেলা যে ঝিঙেগুলো কুটে রাখা হয়েছিল সেগুলো সাঁতলে না রাখলে পচে যাবেনা? টাকা-পয়সা কি খোলামকুচি, না গাছে ফলে?

শাড়ি নিংড়োতে নিংড়োতে বাসনাও সমান ঝাঁঝের সঙ্গে উত্তর দিল, সেগুলো একটু আগেই বেঁধে রাখা হয়েছে। চোখ থাকলেই কেউ রান্নাঘরে গিয়ে দেখতে পারে।

বুঁচির বাপ কখন থেকে এসে বসে আছে। তাকে দুটো খেতে দেবে কোথায়, না পুকুরে গেছে তো গেছেই।

আর সবাই বুঝি ঠুটো জগন্নাথ? দুটো ভাত বেড়ে দিতেও পারে না?

এ-রকম চলে কথার পিঠে কথা। বাসনা তার শাশুড়ির সঙ্গে সমান তালে টক্কর দিয়ে যায়। আত্মরক্ষার সহজাত নিয়মেই সে বুঝেছে যে মুখ বুজে সইলে আর হবে না, তাকে লড়ে যেতে হবে সর্বক্ষণ।

বাসনার আর কোনও দিনই বাপের বাড়ি ফিরে যাবার আশা নেই। তার সইয়ের দাম কানাকড়ি হয়ে গেছে। পরিমল মাস্টার অনেক চেষ্টা করেও গ্রুপ ইনসিওরেন্স কিংবা সরকারের প্রতিশ্রুত টাকা আদায় করে দিতে পারেনি। সবাই জেনে গেছে যে তিন নম্বর নয়, সাত নম্বর ব্লকেই কাঠ কাটতে গিয়েছিল ওরা। সাধ করে বাঘের খপ্পরে গেছে, একটা বে-আইনি কাজ করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে মনোরঞ্জন, সেজন্য কে ক্ষতিপূরণ দেবে?

বাসনার মা সুপ্রভা হঠাৎ মারা গেছে মাত্র দু'দিনের অসুখে। তারপর তিন মাস যেতে না-যেতেই শ্রীনাথ সাধু এক মাঝবয়সি বিধবাকে রক্ষিতা করে এনেছে বাড়িতে। বউ মারা যাবার পর এক জন রক্ষিতা না রাখলে তার মতো মানী লোকের মান থাকে না। কিন্তু তার ছেলে বদ্যিনাথ এটা মোটেই পছন্দ করেনি। সেই জন্য বাপ-ব্যাটাতে এখন লাঠালাঠি চলে। নিতাইচাঁদ বাংলাদেশের চোরাচালানিদের সঙ্গে যোগসাজসে বেশ ভালই রোজগারপাতি করছিল, হঠাৎ এ-দিন বিপক্ষ দলের হাতে বেধড়ক ধোলাই খেয়ে ঠ্যাঙ ভেঙে কাবু হয়ে পড়ে আছে বাড়িতে। ফটিক বাঙালও নদীতে তলিয়ে যায়নি, বরং পদোন্নতি হয়েছে তার। এখন তার দৌড় ক্যানিং পর্যন্ত। সেখানকার এক মাছের আড়তদারের মেয়ের সঙ্গে তার গভীর আশনাই চলছে। বাসনাকে মামুদপুরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আর কার মাথাব্যথা থাকবে?

সময়ের নিয়মে সময় চলে যায়, কেউ কারুর জন্য বসে থাকে না। শুধু বাসনা মাঝে মাঝে ঘুম থেকে উঠে গভীর রাত্রে খাটের উপর জেগে বসে থাকে। এখনও তার আশা, বুঝি হঠাৎ ফিরে আসবে মনোরঞ্জন।

বাসনার দিকে প্রথম নজর দিয়েছিল মহাদেবমিস্তিরির ছোট ভাই ভজনলাল। সে থাকে নামখানায়। মাঝেমধ্যে এ-দিকে আসে। দুর্গাপুজোর সময় ডামাডোলের মধ্যে বাসনার

হাত ধরে টেনে অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। চেঁচিয়ে উঠতেই ভোঁ দৌড়। এর দুদিন পরে, দুর্গাপুজোর ভাসানের সময় কে বা কারা যেন একা পেয়ে খুব ঠেঙিয়েছিল ভজনলালকে। আততায়ীদের মুখ সে দেখতে পায়নি। চিনতেও পারেনি। হাটখোলার সবাই বলল, তা হলে নির্ঘাত ভূতে মেরেছে। এই কথা বলে, আর সাধুচরণের দল হেসে গড়াগড়ি যায়।

দ্বিতীয় জন মোটা সুভাষ। ঠুকঠুক করে এ-বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, নানা ছুতোয় বিষ্টুচরণের সঙ্গে দেখা করতে আসে। বাসনা তার সঙ্গে হেসে কথা বলে, মোটা সুভাষের মনে হয়, তাকে বুঝি বাসনার খুব পছন্দ। কিন্তু বেশিদূর সে এগোতে সাহস পায় না, সাধুচরণ প্রায়ই তার দিকে অমন রাগি চোখে তাকায় কেন? সাধুচরণ ঠিক ধরে ফেলেছে তার মতলব। এর মধ্যে এক দিন বাসনা হঠাৎ মোটা সুভাষকে বলল, আপনি কবিতাকে বিয়ে করেন না কেন? আপনার সঙ্গে ভাল মানাবে। তা শুনে একবারে মাটিতে বসে পড়ল মোটা সুভাষ। যাচ্চলে! এই ছিল মেয়েটার মনে?

সাধুচরণ বাসনার পরিত্রাতা, কিন্তু ইদানীং তারও মনটা ইতি-উতি করে। সেই যে নদীতে মামুদপুরের লোকদের নৌকোটা উলটে যাবার সময় সে বাসনার হাত ধরে টেনে এক হ্যাঁচকা টানে নিজের কোলের ওপর ফেলেছিল, সেই থেকে তার বুকটা খালি খালি লাগে। বার বার সে সেই দৃশ্যটা কল্পনায় ফিরিয়ে আনে, একলা থাকলেই সে শূন্যে হাত দিয়ে সেই রকম হ্যাঁচকা টান দেয়।

কোনও না-কোনও পুরুষমানুষ তো বাসনাকে খাবেই, সাধুচরণ ভাবে, সে খেলে দোষ কী? মনোরঞ্জন ছিল তার বড় আপনজন, সেই মনোরঞ্জনের অবর্তমানে তার জিনিস যদি সাধুচরণ ভোগ করে, তাতে কি খুব অন্যায় হয়? কিন্তু বাসনা তাকে সমীহ করে, তার দিকে ভাল করে মুখ তুলে তাকায় না। এটা বাড়াবাড়ি না? সাধুচরণ আবার সুভাষ-টুভাসদের মতো মিঠে-মিঠে কথাও বলতে পারে না।

আরও যে-ক'জন বাসনার শরীরটাকে খাবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় আছে, তাদের মধ্যে প্রধান হল তার শ্বশুর বিষ্টুচরণ। এটাও এখানকার একটা প্রথা। যে ভাত দেবার মালিক, তার একটা ন্যায্য অধিকার আছে। একটু নিরিবিলিতে পেলেই বিষ্টুচরণ তার পুতের বউয়ের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে। বাঁ-হাতখানা প্রথমে রাখে বাসনার পিঠে। তারপর আঙুলগুলো লকলকিয়ে এগোতে শুরু করলেই বাসনা ছাঁটা মেরে সরে যায়। ষাট বছর বয়েস পেরিয়ে গেছে বিষ্টুচরণের, গত বর্ষায় আছাড় খেয়ে তার একটা পা সেই যে ভাঙল, আর সারেনি। এখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে, চোখে ছানি, তবু এখনও তার লালচ মরেনি। ডলি তো ভালভাবে জানে বলেই সর্বক্ষণ বিষ্টুচরণকে চোখে চোখে রাখে।

যে-সময় কাজ থাকে না, ঘরে ধান থাকেনা, পেটে সর্বক্ষণ খিদে খিদে ভাব, সেই সময়টাতেই যে কেন মানুষের যৌন খিদে বাড়ে, তা বলে যাননি ফ্রয়েড সাহেব। নাকি বলে গিয়েছিলেন? সে-সব কিছুনা জেনেও সাধুচরণ ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ভেতরে ভেতরে গজরায় বাসনার দিকে চেয়ে।

মোটমাট চার-পাঁচটা বাঘ ওৎ পেতে আছে বাসনার দিকে। যে-কোনও দিন লাফিয়ে পড়বে, খাবে। জঙ্গলঘেঁষা দেশে এটাই নিয়ম।

বাসনা অবশ্য এ পর্যন্ত কারুকে ধরা-ছোঁয়া দেয়নি। একমাত্র সেই প্রত্যেকদিন এখনও মনোরঞ্জনের কথা মনে করে অন্তত একবার। প্রায়ই মুচড়ে মুচড়ে কাঁদে। শুধু স্বার্থও নয়, আরও কিছু একটার সম্পর্ক ছিল মনোরঞ্জনের সঙ্গে। তার মাত্র আট মাসের বন্ধন, তারপর এক বছর কেটে গেছে, তবু সেই বন্ধন আরও তীব্র মনে হয়।

কিন্তু এই অবস্থায় আর কত দিন চলবে তার? মাত্র একুশ বছরের ডবকা চেহারার মেয়ে বিধবা হলে তারপর বাকি জীবনটা সে নিখুঁতি সন্দেশটি হয়ে থাকবে? কেউ তাকে খাবেনা? একথা বললে এই জল-জঙ্গল বাদা এলাকার একটা গোরুও বিশ্বাস করবে না। বাসনা নিজেও এ-কথা জানে, সে-ও তো কম দেখেনি।

এক-এক দিন মাঝ রাতে বাসনা নিদ্রাহীন চোখে আর খাটে শুয়ে থাকতে পারে না, বাইরে এসে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে সামনের অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে। ওই অন্ধকারের মধ্যে সে তার ভবিষ্যৎটা খোঁজে। মা নেই, তার বাপ আর তাকে কোনও দিন কাছে ডেকে নেবেনা। শ্বশুরের আর অথর্ব হতে বেশি দিন বাকি নেই। ননদের বিয়ে দিতে হবে, তাতে কিছুটা জমি চলে যাবে। আধপেটা খেয়ে, মান খুইয়ে, শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে কাটাতে হবে সারা জীবন। আর নয়তো...।

শুধু এক জন নেই। অথচ দুনিয়াটা যেমন চলছিল, তেমনই চলছে। মনোরঞ্জন থাকলে সে তার শক্ত কাঁধ দিয়ে এই সংসারটাকে তুলে ধরতে পারত। সে নেই, সে আর আসবে না।

হাওয়া নেই, রাতচরা পাখির ডাক নেই, মাঝে মাঝে কিট কিট কিট কিট শব্দকরছে ঘাসফড়িং, টুপ টাপ করে খসে পড়ছে গাছের পাতা, কোঁয়াক কোঁয়াক করে ডাকছে ব্যাঙ, তাদের ধরবার জন্য সরসর শব্দে এগোচ্ছে সাপ, সামনের খালটা থেকে উঠে আসছে পাট-পচানো জলের গন্ধ, চাঁদ ডুবে গেল মেঘের তলায়। চমৎকার, ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার, বলে কোনও এক বুড়ি হুতোম প্যাঁচা গাছের ডাল থেকে উড়াল দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাটিতে, চিক চিক চিক চিক শব্দে পালাতে লাগল ইঁদুর ছুঁচোরা, দূরে একটা কুকুর অকারণে ঘেউ ঘেউ করে উঠল কয়েকবার।

জীবন চলছে নিজের নিয়মে। নদী বয়ে চলেছে এক মনে, আকাশে ঘুরছে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, দেশ বিদেশ থেকে উড়ে আসছে হাওয়া, একটা জোনাকি উড়ে যায় গোয়ালঘর থেকে রান্নাঘরের দিকে, ঠিক যেমন ভাবে গিয়েছিল গত বছর এই সময়, তার আগের বছর, তার আগের বছর ..।

মাঝ রাতের অন্ধকারে বাসনাকে একলা একা বসিয়ে রেখেই কাহিনিকারকে বিদায় নিতে হবে। এই মেয়েটির জীবনে সুখ-শান্তি ফিরিয়ে দেবার মতো কলমের জোর তার নেই। ইচ্ছে মতো শেষ পরিচ্ছেদে সোনালি সূর্য এঁকে দেবার উপায়ও তার নেই। বাস্তবতার দোহাইতে সে লেখকের হাত বাঁধা।

আগামীকালের কোনও পাঁচালি-লেখক কিংবা পালাকার যদি মনোরঞ্জন খাঁড়ার জীবন উপাখ্যান রচনা করে, তবে সে হয়তো এইভাবে শেষ করবে

বাসনা নামেতে মেয়ে বিধবা অকালে
একা একা কান্দে বসি হাত দিয়া গালে
স্বামী নাই সুখ নাই সম্মুখে আন্ধার
কোন খানে যাবেকন্যা সব ছারখার
জোয়ারের নদী যেন নারীর যৌবন
অসময়ে ভাটি কেবা দেখছ কখন?
মন দিয়া শুন সবে পরে কী ঘটিল
নারিকেল গাছে আসি কে তবে বসিল?
গাছে কেহ বসে নাই, প্যাঁচা দেখি এক
প্যাঁচার উপরে কেবা দেখহ বারেক।
প্যাঁচার উপরে বসি হাসিছেন যিনি
তিনি জগন্মাতা লক্ষ্মী নারায়ণী।
বাসনারে দেখি তাঁর দয়া উপজিল
মানবীর লাগি দেবী অশ্রু নিষ্কাষিল
বাহনেরে কন দেবী চল মোর বাছা
প্যাঁচাও সেই ক্ষণে ছাড়ে নারিকেল গাছা
এ-বন ও-বন ছাড়ি যান অন্য বনে
কাহারে খুঁজেন দেবী ব্যাকুলিত মনে?
এক বন আলো করি আছেন বনদেবী
সিংহ ব্যাঘ্র থাকে তথা তাঁর পদসেবী
সেই বনে আসিলেন লক্ষ্মী নারায়ণী
বনদেবী তাঁকে কন এসো গো ভগিনী
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া কেন এলে এই বনে

কহ সব ত্বরা করি অতীব যতনে।
জগন্মাতা কন তারে, শুন মন দিয়া
এক গ্রাম আছে হোথা নাজনেখালিয়া
সেথা এক বালা কান্দে আছাড়ি পিছাড়ি
নদী কান্দে বন কান্দে আমি ছার নারী
তার পতি হরি নিলে তুমি কোন দোষে?
সবিস্তারে তাহা তুমি বুঝাও বিশেষে।
হাসি কন বনদেবী, সে মনোরঞ্জন
বাসনার পতি সে যে জীবনের ধন
পরীক্ষার লাগি তারে রেখেছি লুকায়ে
যথাকালে দিব তারে স্বস্থানে ফিরায়ে
বছর পুরালে মেয়ে থাকে যদি সতী
অবশ্যই পাইবে সে গুণবান পতি
খাঁটি সতী হয় যদি তার কোন ভয়
সময়ে জীনে স্বামী আসিবে নিশ্চয়।
এই দ্যাখো হাড় মাস, এই দ্যাখো খুলি
এই দ্যাখো মাখিলাম মন্ত্রমাখা ধুলি..
তারপর কী কহিব আশ্চর্য ব্যাপার
চক্ষের নিমেষে হল জীবন উদ্ধার
মাটি থেকে লাফ দেয় সে মনোরঞ্জন
হাতে ঢাল-তরোয়াল বাজিছে ঝন ঝন
লাফ দিয়ে তিন বন চার নদীতীর
পার হয়ে এল চলি সেই মহাবীর
সর্বঅঙ্গ দিয়ে তার বাহিরার জ্যোতি
বাসনার কাছে আসে তার প্রাণপতি

গলায় হিরার হার সর্ব অঙ্গে সোনা
সতীত্বের গুণে হল এমনই বাসনা
বাতাসে ফুৎকার দিল দুই জন মিলে
নতুন অরূপ রাজ্য ফুটিল নিখিলে
তারপর কী কহিব, জয় জয় জয়।
জয় জয় বলো, জয় জয় বলো...

(এই উপন্যাসের সমস্ত ঘটনা ও চরিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কোথাও কেউ কোনও মিল দেখতে পেলে তা সম্পূর্ণ আকস্মিক হলে গণ্য করতে হবে। -লেখক)